পঞ্চম অধ্যায়

বিংশ শতকের শেষ পাদের বাঙালি কবিগোষ্ঠী

কবির কাব্য কত না নিয়মের বাঁধনে বন্দী। ভাষার ব্যাকরণে, সমাজের অনুশাসনে, রাজানুগ্রহে, সংস্কারে কবিতাকে অনেক সময় বন্দী হতে হয়। এরই মধ্যে একদল কবি কবিতাকে সমাজ-বদলের হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করেন। আরেক দল, সমাজের লোকজন যেমন আছে, যেভাবে আছে সেভাবেই তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার করে নিয়ে তাদের বিচিত্র জীবন কাহিনি নিজেদের কবিতায় তুলে আনেন। নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিতজনদের প্রতি গভীর মর্মবেদনা তাঁদের কবিতায় ফুটে ওঠে। সেই সঙ্গে উঠে আসে প্রকৃতির শাশ্বত চিত্র। এঁদের অনেকেই লোকজীবন থেকে সংগ্রহ করেন কাব্য যজ্ঞের পবিত্র সমিধ। আল মাহমুদের কবিতায় এই সত্যটি বার বার দেখা যায়। কবির দুর্বিসহ জীবনের যে ক্লান্তি তার দূর করা জন্য তিনি বার বার ফিরে আসেন তিতাসের তীরে, মেটে ঘরের আঙিনায়, কালচে সবুজ সীমাহীন মাঠের প্রান্তে, গাঁয়ের অক্ষয় বটের তলায়। এখানেই তিনি লোকজীবনের নানা অনুষঙ্গের মাঝে খুঁজে পেতে চান অনন্ত প্রশান্তি। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর কবি মুখে তুলে নিতে চান 'মাটির সানকিতে কুরুলিয়ার কই', 'ডাল', 'সিদলের ঝাল-ভর্তা, 'সালুন', 'শাক-ভাত', 'শামুকের মাংস', নিদ্রা যেতে চান 'ফুলতোলা পুরোনো বালিশ'-এ। লোকজীবনের মধ্যেই কবি জীবন যন্ত্রণা ও আত্মমুক্তির পথ খোঁজেন। মাঝে মাঝে তিনি একাকীত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্য নিসর্গ প্রকৃতি ও লোকজীবনের গভীর সংস্পর্শে আসতে চেয়েছেন -যেখানে তিনি তৃপ্তি খুঁজে পাবেন 'কাইয়ার মতো মুনসি বাড়ির দাওয়ায়'। এখানেই, এই বাংলাদেশেই তিনি সবকিছু আত্মস্থ করতে চান - জননীর হৃদয়, বুবুর ভালবাসা, নরম কলা পাতায় পিঠা -সবকিছু। তাঁর অধিকাংশ কবিতায় পাই বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির আলোকিত উদ্ভাসন। লোকজীবনে লালিত যে ঐতিহ্য তাকেই তিনি একান্ত নিষ্ঠায় আধুনিক বাংলা কবিতায় তুলে ধরেছেন। অপূর্ব তাঁর অলংকার প্রয়োগ, শব্দ-চয়ন, ব্যঞ্জনাময় ভাষার কারুকার্য, চিত্রকল্পের সার্থক ব্যবহার।

আল মাহমুদের কবিতা লোকজীবন-বারি ধারায় স্নাত বলেই সেখানে পাই-

"মানুষের সাধ্যমত ঘরবাড়ি
চাষা, হাল বলদের গল্পে থমথমে হাওয়া।
কিষাণের ললাট রেখার মতো নদী
সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য।

(রাস্তা / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

লোকজীবনের নানা উপাদান তাঁর কবিতায় একাধিক চরণে স্থান পায় এইভাবে -

লাউয়ের মাচায় ঝোলে
সিক্ত নীল শাড়ীর নিশেন
শুঁটকির গন্ধে পরিতৃপ্ত মাছির অওয়াজ।
ভাদুগড়ের শেষ প্রান্তে
এক নির্জন বাড়ির উঠোনে ফুটে আছে
একটি ম্লান দুঃখের করবী।

(রাস্তা / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

যান্ত্রিক সভ্যতা পারেনি লোকজীবন থেকে কবিকে দূরে সরিয়ে রাখতে। তাই তিনি লোকজীবন ও আদিম জনজীবন থেকে সংগ্রহ করেন তাঁর যাবতীয় আত্মবিশ্বাস -

এই গ্রামে আছে এক গোপালক সদাহাস্য চাষি
ধনিয়া কিষাণ বলে ডাকে লোকে গোপী তার নারী
বহুপুত্রে ফলবতী মনোরমা, পরিতৃপ্ত মাতা।
গাভী ও বাছুর নিয়ে সুখী পুত্রগণ।

কবিও সুখী হতে চান বাংলাদেশের লোকজীবনে, পূর্ণতা পেতে চায় তাঁর লোকসত্তা মৃত্তিকালগ্ন জনজীবনে। দেশীয় ঐতিহ্যের নানা উপকরণ তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে শিল্প নির্মাণের অভিন্ন উপাদান হয়ে-

আমার মা বনকচুর ছড়া, বাঘা তেতুল মিশিয়ে
শুঁটকি সহযোগে যে ঘেট তৈরী করতেন
তার জন্য ভেতর থেকে আমার খিদে
মোচড় দিয়ে উঠত।
খেতে দে শিদলের স্বাদ, টাকি মাছের
মাথা ভেঙে সেই অদ্ভুত ঘেট, যা একদা
আমার অতি অনার্য পূর্বপুরুষেরা
মাটির সানকিতে পরমান্ন হিসেবে সাজিয়ে দিতেন।

(জন্ম দিনের কবিতা / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

কবি আল মাহমুদ নানা লোকোপাদানকে শিল্পসৃষ্টির সামঞ্জস্যে সাজিয়ে তোলেন এইভাবে-

"…. ব্যাগ ভরা মেলার তৈজস
পুতুল, মাটির নাও, ঘুম ঘুম খেজুরের রস,
আরও আছে করতাল, বাঁশি, ঢোল ও কাঠের বড় ঘোড়া
আছে হাতি, লাবাতি, মাটির সানকি এক জোড়া।"

(বেলা শেষে কে বালক / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

লোক উপাদান শিল্পগুণ মন্ডিত হয়ে কিভাবে কাব্যকে অলংকৃত করে তোলে তার নিদর্শন মেলে আল মাহমুদের কবিতায় -

বিক্রমপুরের নাওগুলো পাল উড়িয়ে দিয়েছে
বাংলার আকাশ জুড়ে মালার মতো
উড়ে যাচ্ছে হাঁসেরা।
বালি হাঁসেরা দল বেঁধে নামল মেদীর হাওরে
শামুকের মাংসের পাশে জমে থাকা

নির্মল বারির জন্য তৃষ্ণার্ত
শৈবালের দামে চক্ষু ডুবিয়ে তুলে আনে আহার্য ।
(একটি সুহাসিনী বোনের জন্য / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

আল মাহমুদ যে সত্যিই লোকাভরণের অনন্য শিল্পী তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অসংখ্য কবিতায় । 'ভারতবর্ষ' কবিতায় দেখি -

''দূরে গোপদের গ্রাম । প্রজ্জ্বলিত উনুনে এখন
চাষিদের অন্ন উথলায়, ঘরে ঘরে দুহিত গোধনে
পরিতৃপ্ত জনপদ ।

আল মাহমুদের 'অস্পষ্ট স্টেশন' কবিতায় বিষয়বস্তুর মূল ভিত্তিই হল গ্রামীন প্রাকৃত জীবন ঃ-

''সদ্য ধুইয়ে নেওয়া গাভীর বাঁটের মতো
হালকা মেজাজের বাংলাদেশ ।
আমি সর্ষে ক্ষেতের পাশ দিয়ে,
মটরশুঁটির ঝোপ মাড়িয়ে
সেই গাঁয়ের হিজল তলায় দাঁড়াতেই
বৌ-ঝিরা মাছের মতো ঝাঁক বেঁধে
আমাকে ঘিরে দাঁড়াল ।
পাথর কুচির পাতার মতো
তাদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আননে
তাদের খোপা আর বেণী থেকে

ছড়িয়ে পড়েছে
নিশিন্দা নিংড়ানো কেশতেলের গন্ধ ।

দেশজ ঐতিহ্যের মাটি তাঁর কবিতায় শিল্পিত হয় এইভাবে -

''ধানকাটা হয়ে গেছে আমি শুনি সহস্র ইঁদুর এসে
হুটোপুটি করে যায় হেমন্তের শুণ্য মাঠে
সবই শুণ্য মাঠে
ভূমিহীন কিষাণের অফুরন্ত নিঃশ্বাসের হাওয়া
(কালঘুম / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

কবি গ্রাম-বাংলার মানুষকে অবিষ্কার করেন তাঁদের কর্মময় জীবনে-

''তাঁতের উপর ঝুঁকে আছে একটি ঘর্মাক্ত মুখ
মাকু টানছে আর জামদানির নকশা গুম গুম করে আছড়ে পড়ছে ।
সুতোর ওপর যেন বাংলাদেশকে সোনার সুতোয় রূপোর গিঁট মেরে
দৃশ্যমান করে তুলছে এক তাঁতিনির মুখ ।
(বিজলিলাগা দশটি আঙ্গুল / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এই কবিতার সঙ্গে 'অরণ্যে ক্লান্তির দিন' কবিতাটি মিলিয়ে পড়লে মৃত্তিকালগ্ন জনজীবন সম্বন্ধে কবির ধারণা স্পষ্টতর হয় -

''ঝুড়িতে সবজি নিয়ে হেঁটে চাক্‌মা কিশোরী
বিচিত্র কাপড়ে বাঁধা ঘামে ভেজা উপচানো বুকে
বনের রহস্য কাঁপে যেন । ভুরুতে ক্লান্তির নুন
গলে পড়ে গালের দু'পাশে ।''

নদীমাতৃক বাংলাদেশের কবি আল মাহমুদের কবিতায় নদী নির্ভর বাক্যান্বয়ের প্রয়োগ ঘটেছে বার বার । তাঁর প্রিয় নদী তিতাস একাধিক কবিতায় বিশেষ স্ফূর্তি পেয়েছে । দু'একটি উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যটি স্পষ্ট করা যেতে পারে-

''যতবার এসেছি এ তিতাসের তীরে
নীরব তৃপ্তির জন্য আনমনে বসে থেকে ঘাসে

নির্মল বাতাস টেনে বহুক্ষণ ভরেছি এ বুক।
একটি কাশের ফুল তারপর আঙুঁল আমার
ছিঁড়ে নিয়ে এই পথে হেঁটে চলে গেছি। শহরের
শেষ প্রান্তে যেখানে আমার ঘর, নরম বিছানা
ষেখানে রেখেছি দেহ।''
(তিতাস / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

তিতাস শুধু বাংলার মাটিতেই নয়, কবির হৃদয়েও গভীর জলধারা ছড়িয়ে দেয়-

''......অবসাদে ঘুম নেমে এলে
আবার দেখেছি সেই ঝিকিমিকি শবরী তিতাস
কী গভীর জলধারা ছড়াল সে হৃদয়ে আমার।
সোনার বৈঠার ঘায়ে পবনের নাও যেন আমি
বেয়ে নিয়ে চলি একা অলৌকিক যৌবনের দেশে''
(তিতাস / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এই তিতাস নদী কবির কবিতায় ফিরে আসে হতদরিদ্র 'দমবন্ধ বাংলাদেশের' প্রসঙ্গে -
''শুকিয়ে যাওয়া তিতাসের তলদেশে কাদায় লুকানো
বাইম মাছের ফুঁপিয়ে ওঠা।
দমবন্ধ বাংলাদেশের গলা থেকে যেন এক ঢোঁক
কান্না কিছুতেই সরানো যাবেনা।
(স্বরভঙ্গ / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

আল মাহমুদের কাব্যশৈলীর বৈচিত্র ও বিস্তার ঘটেছে তাঁর কবিতার কন্দরে কন্দরে। লোক-অনুপ্রেরণার অভিব্যঞ্জনা শিল্পরূপ লাভ করেছে তাঁর অসংখ্য কবিতায়। স্বদেশের মাটি-মানুষকে ভালবেসে তিনি লেখেন-

''ঘোর লাগা বর্ষণের মাঝে
আজও উবু হয়ে আছি।

ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে
কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম, এ মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।
চতুর্দিকে খনার বচনের মতো টিপটিপ শব্দে সারাদিন
জলধারা ঝরে। জমির কিনার ঘেঁষে
পলাতক মাছের পেছনে
জলঢোঁড়া সাপের চলন নিঃশব্দে দেখছি চেয়ে।

(প্রকৃতি / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

একজন কবির সততা ও নিষ্ঠা যদি নিক্তিতে ওজন করতে হয়, তবে তাঁর রচনার সেই সব পংক্তি চয়ন করা জরুরী, যা বাস্তব অবস্থার শরিক। যে কবির কবিতায় তা বেশি মাত্রায় থাকে, তিনি তত বড় মাপের কবি। আল মাহমুদের কবিতার মধ্যেও তেমন কিছু অবধারিত পংক্তি আছে। যেমন-

"কাউতলী রেলব্রিজ পেরুলেই দেখবেন
মানুষের সাধ্যমত ঘরবাড়ী,
চাষার হালবলদের গল্পে থমথমে হাওয়া।
কিষাণের ললাট রেখার মতো নদী,
সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য।
লাউয়ের মাচায় ঝোলে
সিক্ত নীল শাড়ীর নিশেন।
শুট্কির গন্ধে পরিতৃপ্ত মাছির আওয়াজ।
ভাদুগড়ের শেষ প্রান্তে
এক নির্জন বাড়ির উঠোনে ফুটে আছে
একটি ম্লান দুঃখের করবী।

(রাস্তা / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

উপরোক্ত কবিতাংশে বস্তুগত পরিস্থিতি স্বাতন্ত্রে ও সৃজনধর্মী বৈচিত্র্যে বিশ্বস্ত।

আল মাহমুদের কবিতায় জীবন ও জগতের কালজ্ঞান এসেছে দেশকালের নিহিত নির্দেশ ও ঘটনাবলীর অমোঘ নিয়মেই। কালের জরুরী চেতনাকে স্থানিক প্রত্যয়ে তিনি অঙ্গীকার করে নিয়েছেন এইভাবে -

"গালি-গালাজের ঢেউ টলমলায় আমার উঠোনে
আমারে ভাসিয়ে নেয় খাদ্যলোভী ক্ষোভের কাতারে
সাপের অঙ্গের মতো ভঙ্গি ধরে, টানমারে মিছিলে রাস্তায়।
সাহস দেখোনা মিয়া, শহরে আগুন দিতে আহে ঐ
বেতমিজ গাঁওয়ের পোলারা।
দিল বাইন্দা পথ ঘাট, বাস গাড়ী মোটর দোকান
গোলমালের কারিগর ইটা মারে মুরব্বির গায়।
সাহস দেখো না মিয়া, বে-তমিজের বান্দির পুতেরা
মাইনষের লওয়ের মতো হাঙ্গামার নিশান উড়ায়।

(আমিও রাস্তায় / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

বাংলার দেশজ প্রকৃতির সাথে কবির জীবন বেদনা বোধের নিবিড় সমগ্রতায় একাকার হয়ে যায় এইভাবে -

কিছুই থাকে না দেখ, পত্রপুষ্প গ্রামের বৃদ্ধরা
নদীর নাচের ভঙ্গি, পিতলের ঘড়া আর হুঁকোর আগুন
উঠতি মেয়ের ঝাঁক একে একে কমে আসে
ইলিশের মৌসুমের মতো
হাওয়ায় হলুদ পাতা বৃষ্টিহীন মাটিতে প্রান্তরে
শব্দ করে ঝরে যায়।
কিছুই থাকেনা কেন, করোগেট, ছন কিম্বা মাটির দেয়াল
গাঁয়ের অক্ষয় বট উপড়ে যায় চাঁটগার দারুণ তুফানে।
চড়ুইয়ের বাসা, প্রেম, লতাপাতা, বইয়ের মলাট
দুমড়ে মুচড়ে খসে পড়ে।

ভাসে ঘর, ঘড়া কলসি, গরুর গোয়াল
বুবুর স্নেহের মতো ডুবে যায় ফুল তোলা পুরোনো বালিশ।
(বাতাসের ফেনা / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

আল মাহমুদ সামাজিক চেতনার মানচিত্রেই শুধু স্পষ্ট নন, মানবীয় মমতা ও দেশকালের সঙ্কট উপলব্ধিতেও সংহত -

"ধ্বংসস্তুপের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমি তাদের খুঁজলাম ! না,
চারদিকে ইট আর লোহা ছাড়া কিছুই দেখছি না।
ভাবলাম, আমার প্রিয় নগরী, আমার দেশ, আর আমার
প্রিয়জন যদি লুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বেঁচে থেকেই বা
কী হবে ? আমি বাঁচব কাদের নিয়ে ?
আমার দুচোখ বেয়ে নামল নদী।
আমি নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলাম।"

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা উপরের অংশটি কবির 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' শীর্ষক কবিতা গৃহীত।

শঙ্খ ঘোষ ঃ ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বলো তারে শান্তি' কবিতায় কবি শঙ্খ ঘোষ জীবন-গ্রাহ্যতার অধিকার থেকে যে কটি পংক্তি লিখেছিলেন -

"এই যে ভালো ধুলোয় ধুলোয় ছড়িয়ে আছে দুয়ার হারা পথ
এই যে স্নেহের সারি - আলোয় বাতাস আমার ঘর দিলরে দিল
আকাশ দুটি কাঁকন বাঁধে আমার সন্ধ্যা, আমার ভোর
সোনাবাঁধা - ভুলে যা তুই ভুলে যা তোর মৃত্যু মনোরথ
সেই কথা এই গাছ বলেছে, সেই কথা এই জলের বুকে ছিল,
সেই কথা এই তৃণের ঠোঁটে, ভুলে যা তুই দুঃখরে ভোল তোর,
ধুলোতে তুই লগ্ন হলে আনন্দে এই শূণ্য খোলে জট।

সেই জীবন ও জীবনের স্বপ্ন-স্পর্শিতা একই নিবিড়তায় ধরতে চেয়েছেন কবি তাঁর

১৯৯৯ সালে লেখা 'ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার' কাব্যের 'মঠ' কবিতায়-

''তোমার মাটির কাছে পড়ে আছে পঞ্চাশ বছর
সে মাটির নাম আজ মনে পড়ে বহুদিন পরে
সে মাটির নামে আজ বয়স ভেঙেছে সব বাঁধ।

প্রসারিত গ্রাম-জীবনের অনুপুঙ্খকে ধরে রাখতে চান কবি তাঁর জীবনব্যাপী কাব্য-সাধনায়।

উত্তর - ঔপনিবেশিক ভারতীয় বাস্তবে মানুষ যখন শোষনের জাঁতাকলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, তখনও তার ঐতিহ্যের মাটি থেকে রস আহরণের প্রয়োজন হয়। নতুবা সে প্রতিবাদ তাসের ঘরের মতো ভেঙে যেতে বাধ্য। অতীতের ওপরেই তো বর্তমান দাঁড়ায়, বর্তমানের ওপর ভবিষ্যৎ। নতুবা শুণ্যে প্রাসাদ গড়া হবে। কবি শঙ্খ ঘোষ সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছেন বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংগ্রামী মানুষকে। কবির কাছে এ ব্যাপারটি অজানা নয় যে পাশ্চাত্য আধুনিকতা আমাদের এই ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমিকেই আঘাত করেছে যার ফলে আমরা ইতিহাস হারিয়েছি, ভূগোল হারিয়েছি, মুখোশকে মুখ বলে গ্রহণ করে নিজেদের সব খুঁইয়ে বসে আছি। আবার লোকবসতির বিবর্তনরেখায় শহর পত্তনের নির্মম অনিবার্যতায় 'তিলোত্তমা কলকাতা' ও গ্রাম মানুষের কাছে উপেক্ষিত হয় এইভাবে-

বাপজান হে
কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সকলেই সব জানে
আমিই কিছু জানি না।
আমাকে কেউ পুছত না
কইলকাত্তার পথে ঘাটে অন্য সবাই দুষ্ট বটে
নিজে তো কেউ দুষ্ট না।
কইলকাত্তার লাশে
যার দিকে চাই তারই মুখে আদ্যিকালের মজাপুকুর
শ্যাওলা পচা ভাগে
অ সোনাবউ আমিনা

আমারে তুই বাইন্দা রাখিস, জীবন ভইরা আমিতো -আর
কইলকাত্তায় যাইমু না।

(কাব্যগ্রন্থ ঃ আদিম লতা গুল্মময়, /
১৯৭২ কবিতা ঃ কলকাতা)

উপরোক্ত কবিতায় যে লোকভাবনা তার সাথে কবির মনোগতির সাদৃশ্য রয়েছে কবির 'নিহিত পাতাল ছায়া' কাব্যের 'অলস জল' কবিতায়-

পা-ডোবানো অলস জল, এখন আমায় মনে পড়ে ?
কোথায় চলে গিয়েছিলাম ঝুরি - নামানো সন্ধ্যাবেলা ?
খুব মনে নেই আকাশ -বাতাস ঠিক কতটা বাংলাদেশের
কতটা তার মিথ্যে ছিল বুকের ভিতর বানিয়ে তোলা ঃ
নীল নীলিমা ললাট এমন আজল কাজল অন্ধকারে
ঘন বিনুনি শূণ্যতা তাও বৃক্ষ ইব চতুর্ধারে।
কিন্তু কোথায় গিয়েছিলাম ? মাঝি আমার বাংলাদেশের
ছলাৎছল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে।
সেই শব্দ কুহক, নৌকা কাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের
কিছু হাতে তুলে দাও নি, বিদায় করে দিয়েছ।

লোকায়ত অনুপুঙ্খের আকরণে পুষ্ট শঙ্খ ঘোষের কবিতা। ভৌগোলিক ঘটনা অপেক্ষা সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহের দিকে এই কবির প্রবণতা বেশি। কবি বিশ্বাস করতেন যে ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন বিকশিত হলেও তাঁর মানসিক উদ্বোধন-বিবর্তন ও পরিণতি ঘটে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে। কবির মহত্তম বিকাশ ঘটে সাংস্কৃতিক জগতে। কবি তাই বাংলার এই লোকসংস্কৃতির জগত থেকেই রস আহরণ করেছিলেন-

"তোমার জন্মদিনে কী আর দেব শুধু এই কথাটুকু
আবার আমাদের দেখা হবে কখনো
দেখা হবে তুলসী তলায় দেখা হবে বাঁশের সাঁকোয়

দেখা হবে সুপুরিবনের কিনারে ।''

(কাব্য ঃ ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার, প্রকাশকাল -১৯৯৯, কবিতাঃ জন্মদিন)

এই বিশ্বাসেই নিহিত রয়েছে কবি শঙ্খ ঘোষের সত্তার নির্যাস । এবার কবি শঙ্খ ঘোষের মনোগতি প্রসঙ্গে এমন একটি কবিতাংশের উল্লেখ করব যেখানে শুধু আশাবাদ নেই, আছে জিজ্ঞাসা ও বিস্ময় -

''আবার ফিরে আসে এরকম নিজের মধ্যে ভরে-ওঠা দুপুর
যখন মাথার উপর নিকষ কালো মেঘ
আর অগাধ পাট ক্ষেতের কিনার ঘিরে আমাদের নিঃশব্দে চলা
ছমছমে প্রান্তর জুড়ে খেলনা দুই মানুষ
ভেসে ওঠে সুখে দুঃখে অস্পষ্ট অতীত দিন নিয়ে
ভয়ে ভয়ে সরে আসে শষ্যের পাশাপাশি খুব
কেননা এই সুখ এই দুঃখ এই আকাশ
আমাদের ছিঁড়ে নেয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যথাময়
গ্রামান্তরের দিকে ।
একি মৃত্যু ? একি বিচ্ছেদ ?
নাকি এরই নাম সন্তত জীবন ?

(কাব্যগ্রন্থ ঃ মুর্খ বড়ো, সামাজিক নয়,রচনাকাল -১৯৭৪, কবিতা ঃ সন্ততি)

শঙ্খ ঘোষের কবিতা প্রাণ ও প্রকৃতির সমন্বয়ে ক্রমশ খোদাই করেছে জীবনের বহুবিধ শূণ্যতা, বেদনা, আনন্দ, বিচ্যুতি । আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, গভীর-গহন মনোলোক থেকে আসা তাঁর কবিতা আসলে লোকজীবন-সঞ্জাত অসংখ্য চিত্রকল্পঋদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক এক শিল্প । দু'একটি উদাহরণ-

১। এইখানে চুপকরে দাঁড়িয়ে আছে ডোবা পেরিয়ে ঝুমকাফুলের মাঝখানে
ঠাকুরদাদার মঠ
চতুর্দশীর অন্ধকারে বুকের পাশে বাতি জ্বালিয়ে চুপকরে দাঁড়িয়ে আছে
একা।

{কাব্য ঃ আদিমলতা গুল্মময় (১৯৭২)
কবিতা ঃ ঠাকুরদার মঠ}

২। পুরোনো ধ্বংসের ধারে অবসন্ন শরিকের দিঘি,
রাজবাড়ি, কবুতর ওড়ানো চত্বর
ভাঙা গ্রামে পড়ে আছে।

{কাব্য ঃ তুমি তো তেমন গৌরী নও
(১৯৭৮) কবিতা ঃ আরুনি উদ্দালক }

৩। ভরাট আঙুরের মতো এক একটা গাঁয়ের নাম
আমরা এসে পৌঁছলাম নান্দিনায়।
আলে-থেমে-থাকা জল থেকে
ছেলে মেয়েরা খুঁটে তুলছিল মাছের কণা।

{কাব্য ঃ ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার
১৯৯৯) কবিতা ঃ জলে ভাসা খড়কুটো }

শঙ্খ ঘোষ একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে সংস্কৃতির সাথে যুক্ত থাকলেই লেখার অধিকার অর্জিত হয় না। লেখার জন্য চাই নিরলস সাধনা - তা সে কাব্য-কবিতাই হোক, অথবা গল্প-উপন্যাসই হোক। শঙ্খ ঘোষ এই সাধনা অর্জন করেছিলেন বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণধর্মের মধ্যে। তিনি খুব বড় মাপের কবি ছিলেন বলেই তাঁর সারস্বত প্রজ্ঞায় পাই বঙ্গসংস্কৃতির ঐহিহ্য যা লোকায়ত ধারায় অনুপ্রাণিত। বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে তাঁর শিকড়ের সম্পর্ক ছিল বলেই তিনি লিখতে পেরেছেন -

যাই ছায়াময় ভিড়ে মহানিশি আরতির ধোঁয়া
মাঠের কিনার ঘিরে কেঁপে ওঠে বনবাসী হাওয়া।

যাই পাকা সুপুরির রঙে-ধরা গোধুলির দেশে
আমি যাই।

{কাব্য ঃ কাব্য ঃ তুমি তো তেমন গৌরী
নও (১৯৭২) কবিতা ঃ দশমী। }

বাংলার সংস্কৃতি গ্রাম-কেন্দ্রিক। গ্রাম-সমাজের বহু লৌকিক উপাদানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। বাংলাদেশের বিস্তৃত পরিসরে গ্রামের নানা প্রান্তের কত বিচিত্র মানুষ তাঁর মনোলোকে স্থান করে নিয়েছে। বঙ্গ সংস্কৃতির বহতা সত্য বাণীর মর্ম অধিগত করেই শঙ্খ ঘোষ বাংলা কাব্য সাহিত্যে নিজের আসনটি স্থায়ী করেছেন। এই বঙ্গ-সংস্কৃতিকে বিপন্ন হতে দেখে তিনি লিখেছেন-

নোটন নোটন পায়রাগুলি খাঁচাতে বন্দী
দু-এক মুঠো ভাত ফেলে তা ওড়াতে মন দি'।
দু-পারে দুই রুই কাৎলার মারণী ফন্দি
বাঁচার আশায় হাত-হাতিয়ার মৃত্যুতে মন দি'।
যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।

(কাব্য ঃ দিনগুলি রাতগুলি, কবিতা ঃ যমুনাবতী)

অমিতাভ দাশগুপ্ত ঃ ১৯৫৭ তে 'সমুদ্র থেকে আকাশ' কাব্যগ্রন্থ প্রমাণ করেছিল অমিতাভ দাশগুপ্ত শুধু সৃজনশীল কবি নন, বহুমাত্রিক স্বজনশীল কবি। দীর্ঘদিন তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে ছিলেন। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে তাঁর কবি মনোগতির পরিচয় পাই এই সব কাব্যে - 'মৃত্যুর অধিক খেলা' ১৯৮২), 'আগুনের ডালপালা' (১৯৮৪), 'বারুদ বালিকা' (১৯৮৮), 'কমলালেবুর অশ্রু' (১৯৯১), 'আমাকে সম্পূর্ণ করে নাও' (১৯৯২), 'এসো স্পর্শ করো' ৯১৯৯৩), 'ছিন্নপত্র নয়, ছেঁড়াপাতা' (১৯৯৫), 'আমার নীরবতা, আমার ভাষা' (১৯৯৯), 'এসো হোম' (২০০০), 'নীল সরস্বতী' (২০০১), 'দ্রাবিড় শর্বরী' (২০০১)।

জীবন থেকে জীবন দর্শনে পৌঁছোনোর সামর্থ অর্জন করেছিলেন কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত। জীবনে বহুবার সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলেন, কিন্তু ভেঙে পড়েন নি। ১৯৬০-এর উত্তরবঙ্গে যাপন জর্জর দিনগুলির অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছিল। তাঁর চারপাশের মানুষের বিপর্যয় তাঁকে মানবিক বেদনায় আপ্লুত করেছিল। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি গ্রাম অথবা দক্ষিণবঙ্গের গোপীবল্লভপুর গ্রাম শুধু নয়, বাংলা তথা ভারতের গ্রামাঞ্চলে যে আদর্শের লড়াই ও আত্মত্যাগ তা তাঁর কবি-চৈতন্যকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। গ্রামের দুঃখী মানুষগুলোকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন ১৯৫৯-এ। এরপর ১৯৬২-র চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, ১৯৬৪-তে কমিউনিস্ট পার্টির দু'ভাগ হয়ে যাওয়া, ১৯৬৬-তে নতুন মাত্রায় খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯-এ যুক্তফ্রন্ট গঠন ও পতন, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, অতঃপর নকশালবাড়ি আন্দোলন, শ্বেত সন্ত্রাস, ১৯৭৫-এর জরুরী অবস্থা ও গণতন্ত্র হত্যা, সমাজতন্ত্রের নব নব বিজয়, আশির দশকের খরা সময় ও মরা সময়, আন্দোলন বিমুখতা, মুক্ত অর্থনীতি ও ক্রমশ বাজার অর্থনীতির বিস্তার, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন, পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনের পতনের গর্জন, 'অবশেষে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের আগ্রাসন, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিশ্বব্যাপী করাল থাবা, নবরূপে প্রতিষেধকের ভূমিকায় মায়াবী সাম্রাজ্যবাদ, ফলত পরিস্থিতি সাম্রাজ্যবাদের করতলগত হয়ে যাওয়ায় আবিশ্ব সংকট- পেন্টাগন ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড্ সেন্টারে সন্ত্রাসবাদী হামলা, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের শ্লোগানের আড়ালে থেকে সাম্রাজ্যবাদের নবসন্ত্রাস কায়েমের প্রক্রিয়া ও আফগানযুদ্ধ'- ইতিহাসের এসব কিছুই কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। এরই প্রেক্ষাপটে কবির মনোগতির স্বচ্ছ পরিচয় পাই 'সমুদ্র থেকে আকাশ' কাব্যগ্রন্থের 'সতরঞ্চ' কবিতায় -

"মেঘে মেঘে এ যে কত বেলা
কালিদহে আবর্তিত বুঝেও বুঝিনা কেন আমি
আঁজলা ভরে যতই না জল তুলি, তবুও কুলোবে না
জীবনের অগস্ত্য পিপাসা।"

পৌরাণিককাল ভিত্তিক জীবনের উপাদান - কালীদহ, অগস্ত্য প্রভৃতির উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে কবি বর্তমান কালের সংগ্রামী জীবন-দ্যোতনাকে ফুটিয়ে তুলে লোকজীবনের শরিক হয়েছেন ।

অমিতাভ দাশগুপ্ত সংবেদনশীল কবি । বাংলাদেশের অনেক কিছুর সঙ্গেই রয়েছে তাঁর মানসিক যোগ -

"যে দিকে তাকাই, শুধু বাংলাদেশ ।
চলে যাই লহমায় সোনা রং ফেলি তার পাশ
আমার স্বপ্নের খিলখিল পদ্মা
বহে আনে পিনিশ সালতি ভরা রূপেলি ইলিশ ।"

(কাব্যগ্রন্থ ঃ নির্বাচিত কবিতা,
কবিতা ঃ পাশপোর্ট বিহীন বাংলাদেশ)

কবি-চৈতন্য কিভাবে মানব-চৈতন্য ভাবনায় অখন্ড হয়ে যায় তার প্রমাণ রয়েছে কবির আর একটি কবিতায় -

"মা,
তোমার শাঁখা ভাঙা হাত দুটি কি দিয়ে সাজাবো ?
রক্তের বেগার্ত ঢলে
ভাসে মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, পদ্মায় বেহুলা
মর্টার গোলার পাশে ।"

(কাব্যগ্রন্থ ঃ নির্বাচিত কবিতা, কবিতা ঃ
শাঁখা ভাঙা হাত)

দেশজ চৈতন্য স্থিত হয়ে কবি এইভাবে প্রকৃতিলগ্ন মানুষের কথা বলেন -

"ধানের বুকের দুধে হাত দাও ।
মনে হবে নারী
আমি সেই নারীকে জপাতে
সারারাত উবু হয়ে বসে থাকি হেমন্তের মাঠে ।"

(কাব্য ঃ আমি তোমাদেরই লোক , কবিতা ঃ
ধান ও মাঠের কবিতা)

'জন্মদাও' কবিতার কায়া নির্মাণে অমিতাভ দাশগুপ্ত যে শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন তাতে বাংলার প্রকৃতি ও লোকজীবনের প্রসঙ্গ একাকার হয়ে যায়। নকুলদানা, বাতাসা, দুধ, ডাব, মানত, বাঁজাবউ, পুঁইডগা, তরকারি, ভাতার, বীজতলা, কোদাল, খুর্পি, স্বর্ণচাঁপা, জহুরিচাঁপা, চিনিচাঁপা, নমাজ, শীতল পাটি, ফুলতলি, রাঙাবউ, আম-জাম-পিপুল, বসতবাড়ী, গোবরমাটি প্রভৃতি লোকজীবনের অনুসঙ্গগুলিকে যথাযথভাবে সাজিয়ে কবি এখানে সৌন্দর্যকেই দ্যোতিত করেছেন-

''নকুলদানা বাতাসা দুধ আর ডাব হাতে
মানতের থানে লাইনে দাঁড়িয়ে আছো বাঁজাবউ
আর চাইছো তোমার রুখু শরীরের মাচা।
পুঁই ডগায় লকলকিয়ে উঠুক।
সুযোগ এলে ঠাকুরের পাথুরে পা মুছিয়ে দিচ্ছো
সেই দীর্ঘ চুল যা জাপ্টে ধরে
তরকারিতে নুন কমের জন্য তোমাকে চাবকাতো তোমার ভাতার
বীজতলায় কোদাল-খুরপি চালিয়ে অনেক যত্নে গড়ে তোলা
স্বর্ণচাঁপা জহুরীচাঁপা চিনিচাঁপার বাগানে
বৃষ্টির শেষে এক আকাশ নমাজের মতো
কেমন ছড়িয়ে যাচ্ছে সাত রঙে বোনা শীতলপাটি
দ্যাখো কুলতলির রাঙাবউ,
দেখতে দেখতে তোমার ভেতরে ফুটে উঠুক
আম-জাম-পিপুলে ঘেরা বসত বাড়ির ঘ্রাণ
আর তোমার ইচ্ছের মতো কাঁপতে থাকুক
গোবর মাটি মেশানো একটি কুঁড়ি
ভীরু শিশুচারার একটি অভিমান।[২]

নারীকে কেন্দ্র করে এখানে কবির যে বিচিত্র অনুভূতিমালা গড়ে উঠেছে প্রত্যাশায়, আকাঙ্খায়, পরিহাসে, আসক্তিতে, বীতস্পৃহায় - তা বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে লোকচেতনার আলোয়। কবিতাটি লোক-ঐতিহ্যের রসরূপ মাত্র নয়, দিনানুদিনের তুচ্ছতায় অনুলিপ্ত হয়েও নারীর মধ্যে যে সঞ্চিত শক্তি ও আবেগমূল্য এখানে তা সুনিশ্চিতভাবে মর্ত্যমুখী হয়েছে। নারী কল্পনা ও প্রেমচেতনা এখানে যতখানি কাব্যময় তার চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্রময়। অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা আরও একটি কারণে সমৃদ্ধিময় হয়ে ওঠে চিত্রকল্পের ইতিবাচক তাৎপর্যে। তাঁর কবিতার ভাষা আধুনিক মননে বিস্তৃত ও ইঙ্গিতগুলি সুনির্মিত, লাবণ্যময়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, আধুনিক সভ্যতা আসলে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। বৃহৎশিল্প, কলকারখানা-যন্ত্র-বিজ্ঞান প্রযুক্তি আধুনিক যুগকে কিভাবে দিনের পর দিন জটিল করে তুলেছে তা তিনি নিয়ত প্রত্যক্ষ করেছেন। মানুষ ক্রমশ হয়ে উঠেছে ঐহিক স্বার্থবাদী, জড়বাদী ও ভোগবিলাসী। যান্ত্রিক সভ্যতায় নগরজীবনের মানুষ কেবল নিজের স্বার্থ, সুখ নিয়েই মগ্ন। তার মনে প্রেম নেই, আত্মত্যাগ নেই, নেই করুণা ও নীতিবোধ। প্রেম ও করুণা, প্রীতি ও ভালবাসা ছিল কৃষি সভ্যতায়, ছিল গ্রামে ও জনপদে, ছিল ধনতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতার আবির্ভাবের পূর্বে। আজকের নীতিহীনতা, আদর্শহীনতা ও প্রেমহীনতার মধ্যে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যেন এক নিঃসঙ্গ প্রেমের পুরোহিত। এই একটি ক্ষেত্রে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য বা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কবি যখন বলেন-

"একমাত্র সেইসব রাস্তার কথাই আমি
লিখতে পারি,
নিত্য ধুলো আমার পায়ে এখনো
লেগে আছে।
যার ধুলো উড়িয়ে আমি কখনো হেঁটে যাই নি,
তেমন কোনো রাস্তার কথা আমি
লিখতে পারি না।[৩]

শক্তি চট্টোপাধ্যায় তখন আর এক পথের কথা বলেন -

"এই পথে দেবদারু -বাদুড় বনের ভাঁট ফুল ।
মজা দিঘি, ভাঙা গ্রাম, দোলমঞ্চ
ব্যর্থস্থপতির নশ্বর হাতের কাজ
জোনাকির আলো ।"[৪]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা শুধু অর্থময়তায় নয়, সততার প্রশ্নেও এইভাবে জোরালো হয় -

তেমন কোনো গাছের কথাও না, যার
ডালপালা, পত্রপল্লব, ফুল আর ফলের সঙ্গে
আজ অবধি আমার কোনো কথাবার্তা হয়নি ।
তেমন কোনো মানুষের কথাও না, যার
কণ্ঠস্বর কিংবা
চকিত ভ্রূভঙ্গি আজও আমার
হৃৎপ্রদেশে এসে পৌঁছোয় নি ।[৫]

অবক্ষয় সর্ব্বস্ব আত্মিক নৈরাজ্যের মুখপাত্র হিসেবে নীরেন্দ্রনাথকে কোনোদিনই উপস্থাপিত করা যাবে না বাংলা কবিতার রাজ্যে । কারণ তাঁর কোনো কবিতাই সত্য ছাড়া সত্যভ্রম উৎপাদন করেনি । একটি কবিতায় তিনি প্রাণের মধ্যে প্রাণ খুঁজে পান এইভাবে -

"পুকুর, মরাই, সবজি বাগান, জংলাডুরে শাড়ী,
তার মানেই তো বাড়ী ।
তার মানেই তো প্রাণের মধ্যে প্রাণ,
নিকিয়ে নেওয়া উঠোনখানি রোদ্দুরে টান্ টান ।
ধান খুঁটে খায় চারটে চড়ুই, দোলমঞ্চের পাশে
পায়রাগুলো ঘুরে বেড়ায় ঘাসে ।
বেড়ালটা আড়মোড়া ভাঙছে, কুকুরটা কান খাড়া

করে শুনছে কথা বলছে কারা ।
পূবের সূর্য পশ্চিমে দেয় পাড়ি,
দুপুর বেলার ঘুমের থেকে জেগে উঠছে বাড়ি ।[৬]

পণ্যায়নের যুক্তি -শৃঙ্খলার ফাঁদে পা দেন নি তিনি, প্রতিষ্ঠানের লোভনীয় হাতছানিতে সাড়া দেন নি তিনি । তাঁর কবিতায় মানব-সমাজকে বিপথগামী করার আয়োজন নেই । তাই তাঁর কবিতা বেঁচে থাকার হাতিয়ার হয়ে ওঠে অনেক সময়-

বেঁচে থাকো, যে আছ যেখানে
বেঁচে থাকো ।
যেমন করেই হোক, মরতে-মরতে মৃত্যুর পাঁজরে লাথিমেরে
বেঁচে থাকাটাই বড়ো কথা ।[৭]

মহাসমুদ্রের খ্যাপা ঢেউয়ের চূড়ায় নৌকো নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে যারা মৃত্যুর মুঠোর মধ্যে যুঝে যায়, নদীতে ঘরবাড়ি, খেতখামার, গাছপালা বিসর্জন দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদের মতো অন্য আশ্রয়ের খোঁজে টলতে টলতে যারা চলে যায়, অথবা-

''দ্বন্দ্বের মীমাংসা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যে এখন
হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রয়েছে কোথাও''

তার উদ্দেশ্যেও কবির উষাযাত্রার ইতিবাচক শব্দমন্ত্র ধ্বনিত হয় এইভাবে-

''বেঁচে থাকো, হার মেনো না, প্রত্যেকে তোমরা বেঁচে থাকো / জেনে রাখো, / মাত্রই একবার এই পৃথিবীর মুখ দ্যাখো সবাই ।''

গ্রাম-জীবনের প্রকৃতি-পটভূমিতে এই দেখা যে কত অপরূপ তা কবি নীরেন্দ্রনাথের কাছে অজানা নয় । 'বাঁচা, এরই জন্যে বেঁচে থাকা' কবিতায় উপরোক্ত মন্তব্যের সমর্থন রয়েছে -

দ্যাখো আলো, দ্যাখো ছায়া, দ্যাখো
গাছপালার স্থির মৌন ডালপালা কাঁপিয়ে

অকস্মাৎ
ঝোড়ো বাতাসের ছুটে যাওয়া।
দ্যাখো যে, মেঘ ছিঁড়ে ফের ঘাসের উপরে
রোদ্দুর পড়েছে,
দিঘির দর্পণে ফের তন্ময় নিজেকে দেখছে সুপুরির সারি,
উঠোনে বেড়াচ্ছে ঘুরে পায়রা ও চড়ুই,
জানালার শিক আঁকড়ে ধরে
জুঁই লতাটি উঠতে চাইছে আকাশের দিকে।
সবাই একবারই মাত্র পায় এই অপরূপ দৃশ্যের মিছিল
দেখবার সুযোগ।
পুনর্জন্ম নেই, তাই দুইবার দ্যাখে না।

(দেশ, ১৭ অক্টোবর, ১৯৯৭ / পৃষ্ঠা ৫২)

লোকজীবনের ক্ষেত্রে এটাই তো সার সত্য। 'মানুষের চোখে' দেখা তো মাত্র একবারই হয়। জন্মাবধি নিরন্তর মানুষ এই কথাটাই জেনে এসেছে। আর তাই 'হেরে যেতে-যেতে আমরা হারিনা, / যে-মাটি জীবন, সেই মাটির উপরে মাথা খুঁড়ি, / পরক্ষণে সেই মাটির উপরেই দাঁড়াই শক্ত পায়ে। / বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে জরুরি।' (তদেব।)

কবি নীরেন্দ্রনাথ জীবনের কথা তখনই বড়ো বেশি করে বলেন, যখন লোকজীবনে প্রতিবাদী চেতনার অসাড়তা তাঁকে ভাবিত করে -

'পৃথিবী ক্রমশ গিয়ে ঢুকে পড়েছে রাত্রির আঁধারে।
কেউই বলছে না কোনও কথা।
মানুষ বলছে না কিছু,
কোনোখানে পাখিও ডাকছে না।

(কবিতা ঃ জাহাজঘাটায় আজকাল / ১২ এপ্রিল,
১৯৯৬ 'দেশ', শারদসংখ্যা / পৃষ্ঠা ৩৩১)

ঔপনিবেশিক ও উত্তর - ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক রাজনীতি নীরেন্দ্রনাথ চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি বলেই তিনি ঐতিহ্য - বিযুক্ত হতে পারেননি। তাই তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে উত্তরণের আকাঙ্খা। অবশ্যই তা লোকজীবন কেন্দ্রিক। দ্রষ্টাচক্ষু রয়েছে নীরেন্দ্রনাথের। তাই তিনি অতন্দ্র প্রহরায় দীপ জ্বেলে রেখেছেন মানুষকে তার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্যে। দ্রষ্টাচক্ষু হারান নি বলেই তাঁর মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্র - জীবনানন্দের সামগ্রিক বোধ। সচেতন কবি বলেই তিনি অদ্ভুত আঁধারের অবসান চেয়েছেন। আর তাই তাঁর কবিতায় বার বার ধ্বনিত হয় লোকমনের চির আকুতি, 'কার্তিকে - অঘ্রাণে বেঁচে ওঠা।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ কবিতার ব্যাপারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে মতবাদে আজও সুস্থির তা হল এই যে কবিতা দীক্ষিত পাঠক-পাঠিকাদের জন্য শিল্পের একটি সূক্ষ্ম শাখা। সারা পৃথিবী জুড়েই প্রকৃত কবিতার পাঠক এক অতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কবিতার ক্ষেত্রে এরা সংখ্যালঘু হলেও সারা জীবনের জন্য নিবেদিত প্রাণ। বিজ্ঞানের জটিল অঙ্ক বুঝতে গেলে যেমন সিঁড়ির একেবারে প্রথম ধাপ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান যার নেই, সে যেমন কোয়ান্টাম থিয়োরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তেমনি ভাষা ব্যবহারের বিবর্তন অনুধাবন না করলে কবিতার সাম্প্রতিক রূপ বোঝা সম্ভব নয়। গদ্যের তুলনায় কবিতার ভাষা অনেক দ্রুত বদলায়। একই শব্দের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ব্যঞ্জনা। এ বিষয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বাতায়ন শব্দটি শ্রুতিমধুর, গবাক্ষ শব্দটি চিত্রধর্মী, কিন্তু একালের কবিতায় পরিত্যাজ্য। কিছু কিছু শব্দ বহু ব্যবহারে জীর্ণ, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্লিশে। আবার, আশ্চর্যের বিষয় এই, কিছু কিছু শব্দ বহু ব্যবহারেও অম্লান।'[৮] কবির বক্তব্যের অনুসরণে আমরা তাঁর এমন কয়েকটি কবিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পারি যেগুলিতে শব্দ হয়েছে কাব্য-শিল্পের প্রধান বাহন-

> ''মৌমাছিরা মধু জমায় মানুষের জন্য
> হাঁস-মুর্গীরা ডিম পাড়ে মানুষের জন্য
> পুকুরে শালুক ফুটছে মানুষের জন্য
> পাহাড় থেকে নদী গড়িয়ে আসছে মানুষের জন্য

বীজ একদিন মহীরূহ হচ্ছে মানুষের জন্য
বিন্নিঘাস ও তলতা বাঁশ বুক পেতে দিচ্ছে
মানুষের জন্য ।''

(কবিতা ঃ এক বিশ্বব্যাপী একাকীত্বের মধ্যে, কবি ঃ
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'দেশ' ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ পৃষ্ঠা-৫৯)

মৌমাছি, মধু, হাঁস, মুর্গী, ডিম, পুকুর, শালুক, পাহাড়, নদী, বীজ, বিন্নিঘাস, তলতা বাঁশ - এই শব্দগুলো আজও কবিতায় পুরোনো হয়নি । কবির মনোভাবটি এখানে স্পষ্ট । তিনি পাঠকের মনে গ্রাম-জীবনের উপাদান সমৃদ্ধ শব্দ সম্ভারের আবেদনকে পৌছে দিতে চান -

চরাচর জুড়ে এক নিবাত নিষ্কম্প নিস্তব্ধতা
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শিশু
সমস্ত ঘৃণা ও অবিশ্বাসের গরল মন্থন করে
সে ঠিক উঠে এসেছে আবার
এক বিশ্বব্যাপী একাকিত্বের মধ্যে সে হাঁটছে
আস্তে আস্তে পা ফেলে
তার শীত করছে
শুধু তর জন্যেই আবার জাগতে হবে সূর্যকে ।

এ-ই তো আশাবাদী কবির জীবন-বিশ্বাস । হয়ত মারণ-মহাযজ্ঞে একদিন নদী শুকিয়ে যাবে, পাহড়ে একটুকরো পাথর থাকবে না, রাজনীতির পাশা খেলোয়াড়দের ক্রীতদাস হয়ে হয়ত গোটা মানব সমাজে একদিন নেমে আসবে মহা বিপর্যয় । কিন্তু কবির কাছে এটাই শেষ কথা নয়, শেষ কথা 'টল টল পায়ে হেঁটে যাওয়া শিশুটির জন্যই আবার জাগতে হবে সূর্যকে ।' এই শিশুই লোক-জীবন ধর্মের অবধারক । এর জন্যেই আবার সৃষ্টি হবে স্নেহ-মমতার বারি সিঞ্চনে ছোট ছোট সাংসারিক উদ্যান ।

এক সময়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থাকতেন পূর্ববঙ্গে 'দেশের বাড়ি'তে । সেখানেই তাঁর কৈশোর কেটেছিল । ভারত ভাগ হবার পর তাঁর সেখানে ফেরা সম্ভব হয়নি । পূর্ববঙ্গের

গ্রাম-জীবনের সব অভিজ্ঞতাকে কবি কাজে লাগিয়েছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে। কবির কবিতায় উপস্থাপিত গ্রাম বাংলার পারিপার্শ্বিক সম্পর্ককে তাঁর সচেতনতার রূপটি লোকচেতনায় স্ফুরিত হয়েছে বার বার -

আঁকাবাঁকা সাঁকো দোদুল্যমান, ওপারে দুঃখীগ্রাম
যারা যায় তারা অনেকে ফেরে না সন্ধ্যার আলোছায়ায়
ডাকে তক্ষক, বটের শাখায় ননী পিসিমার প্রেত
এদিকে তাকায়, ডাকে আয় আয়, আমাকেও কৈশোরে।[৯]

এই ডাক কবি তখনো উপেক্ষা করতে পারেনি, যখন-

"বিমান যাত্রী আমি
দুধ সমুদ্র, অলীক প্রাসাদ, হুইস্কি, সজল জাগা
টাইম ম্যাগাজিন, ইরাক ও বুশ, হারছেন ডারউইন
তবু ডাক শুনি ননী পিসিমার, ঠিক ত্রিস্তর ছবি।"

কবির কাছে মায়াজাল বিস্তার করেছিল গ্রামের বসন্ত, দিগন্ত ছোঁয়া পাটক্ষেত, বৃষ্টি ধোয়া মাঠ, সোঁদা মাটির গন্ধ। কবি যদি কোথাও কখনো একাকিত্ব বোধ করেন আজ, তা হলে সেই ফেলে আসা সবুজ মাঠের জন্যই, যেখানে -

শুধু মাঠ, সবুজের ঢেউ,
জন্মের প্রথম কান্না,
উদ্ভিদের মতো আমি মাথা তুলে উঠেছি এভূমি, জলকাদায়
এই বাংলায়
ঝিনুক তোলার জন্য ডুবে গেছি অনেক গভীরে
বুলবুলি পাখির ডিম চুরি করে, ফের রেখে এসেছি সে নীড়ে।
পুকুরের জলে চাঁদ ডুবে যায়, আবার চকিতে ঠিক ভাসে
ঝড়ের সুগন্ধ আমি পেয়েছি যে কতবার পশ্চিমের উড়ন্ত বাতাসে।।
সবুজের বুক চেরা হাইওয়ে,

গাড়ি থেকে নেমে আমি দাঁড়িয়েছি একা
কেন চোখে জল আসে, কেন মনে হয়
আমি এই পৃথিবীর কেউ নয়।

(কবিতা ঃ এক সন্ধে থেকে মধ্যরাত্রি
কবি ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'দেশ' ঃ
১৭ জুলাই, ১৯৯৫ / পৃষ্ঠা ৪১)

গ্রাম - বাংলার প্রেক্ষিতে কৈশোরের স্বপ্নময় ছবি কবির অপরাহ্নিক জীবনে গাঁথা হয়ে আছে। 'দীর্ঘশ্বাস' কবিতায় দেখি -

পেয়ারা গাছের ডালে দোল খায় কৈশোরের স্বপ্নময় ছবি
জলের আয়নায় স্বর্ণ ভোরবেলা
মাধুর্যের কণাগুলি ঝলসে ঝলসে উঠে গুপ্ত ইশারার
আলোক লতার মূল খোঁজে এক দার্শনিক,
হেসে উঠে অবিশ্বাসী কবি
আকাশের দেবতারা লোভীর মতন দেখে,
কত দীর্ঘশ্বাস উড়ে যায়।

(কবিতা ঃ 'দীর্ঘশ্বাস বিন্দু বিন্দু'
কবি ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
'দেশ' ঃ ২৫ নভেম্বর, ২০০০)

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় যখন উঠে আসে জীবনের সুর ও বাণী তখন তাতে মিশে থাকে লোক - অভিজ্ঞতার স্পর্শ, স্মৃতিপথে উদিত হয় লোকায়ত অভিজ্ঞতার চাপ।

জয় গোস্বামী ঃ 'নিজের জীবন, বীজের জীবন' আত্মকথায় জয় গোস্বামী লিখেছেন, 'প্রথম লেখা যখন ছাপা হয়েছিল তখনো শুনেছি, এখনো শুনি সেই প্রশ্ন - 'কেন লেখো' ? এর নিশ্চিত কোনো উত্তর কি জানি আমি ? যতবার এই প্রশ্নের দিকে তাকাই ততবারই ভেসে উঠে পরপর সব ছবি। কোনটা ব্যক্তিগত জীবনের, কোনটা

চলমান এই জীবন স্রোতের। এই দুই জীবনের ধাক্কা থেকে ছিটকে ওঠে কোনো ছবি, এই দুইয়ের একাকার হয়ে যাওয়া মিলনেও জন্ম নিতে চায় কেউ কেউ।'

(দেশ, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ / পৃষ্ঠা ৫৭)

জয় গোস্বামীর অসংখ্য কবিতায় রয়েছে লৌকিক উপাদান যা কখনো ব্যক্তিগত জীবনের সাথে আবার কখনো বা চলমান জীবনস্রোতের সাথে অন্বিত। 'এখানে তোমার মাটি দেশ' কবিতাটি শুরু হয়েছে এইভাবে-

তোমার নদী ছিল।
বাঁকা হয়ে, আঁকা হয়েছিল, আছে, বাঁশ ঝাড় ঘুরে....
এপার কি মাধবপুর ? ওই পার বনশিমতলা ?
এই পারে বাবলা গাছ, দুটো চারটে ডাল জল ছুঁয়ে
আড়াআড়ি বেড়ে গেছে, জলে মাথা ঠেকাচ্ছে হাওয়ায়।
জলের উপরে যেন আনমনে, শেষ হয়নি সাঁকো ....
পাখি বসছে তার উপরে, লম্বা ল্যাজ, কী জানি, কী পাখি।
বসছে আর ডাল থেকে ফুল খসে পাপড়ি পড়ছে জলে
জল শান্ত, এসময়, ভরাভরতি দুপুর বেলায়
প্রায় পথচারী নেই, প্রায় কোনো স্নানার্থীও নেই।
দুটো বাচ্চা বহুক্ষণ ঝাঁপাঝাপি করছে আঘাটায়
পাপড়িগুলো ভেসে যাচ্ছে কচুরিপানার সঙ্গে মিশে
ডিঙিতে কাঠগুঁড়ি তুলছে মাথায় গামছা বাঁধা লোক
এপার মাধবপুর, ওই পার বনশিমতলা ?

(দেশ ঃ ৪ এপ্রিল, ১৯৯৮ / পৃষ্ঠা ৬৫)

উদ্ধৃত কবিতাংশের প্রায় প্রতিটি পংক্তিতেই আছে গ্রামজীবন ভিত্তিক অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ। কবি তাঁর বোধ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে কবিতাটি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা আমাদের বেঁচে থাকাকে ছুঁয়ে থাকে। এই কবিতার সাথে যুক্ত জীবনবোধ যে কত বাস্তব, কত প্রামাণ্য

এবং কতখানি সত্য তার অজস্র প্রমাণ মেনে জয় গোস্বামীর অন্যান্য কবিতায়। 'ন হন্যতে' কবিতাটির কথাই ধরা যাক-

''সেই যে সেই অন্ধকার মাঠের পর মাঠ
সেই যে সেই ভেঅরবেলার ক্ষেতের পর ক্ষেত
ক্ষেত পেরিয়ে ঝোপের পাশে হাঁটা পায়ের নদী
এপারে আর ওপারে গ্রাম কুপি জ্বালার ঘর
ঘর না চালা ? খাটিয়া বেড়া উঠোন চারপাই
মুর্গি ঘোরে, বালতি, জল, না-মাজা বর্তন.....'

এই জেহানাবাদ গ্রামে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জমিদার গুন্ডাদের গণহত্যার বলি হয়েছিল একষট্টি জন গ্রামবাসী। নিহতদের মধ্যে পঁয়ত্রিশজন ছিল মহিলা আর শিশু। নকশালপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি হবার কারণে এই গ্রামটি বেছে নিয়েছিল ভূমিহারদের নিজস্ব বাহিনী রণবীর সেনা। অসহায় গ্রামবাসীদের পক্ষ নিয়ে কবি জয় গোস্বামী সেদিন লিখেছিলেন-

''আক্রমণ করো নয়তো আক্রান্ত হবে
জোট বানাও, বন্ধু করো, ফিরো না এক পা-ও
লুকিয়ে থাকে পাহাড়ে জলে খনির গহ্বরে
উঠে আবার উল্টোমার দাও।'

(কবিতা ঃ 'নহন্যতে', দেশ ঃ ১৪ নভেম্বর, ১৯৯৮)

এ শুধু শ্লোগান নয়, এ কবির স্বীকারোক্তির কাব্যিক প্রকাশ, 'পারবো, আমরা নিশ্চয়ই পারব একদিন। কারো কম থাকবে না। সবাই ভাগ করে খাবো। জানি, শক্ত। জানি, অসম্ভব-প্রায়। জানি, পৃথিবী শুধু ঘাতকের হাতে। হয়ত, অস্ত্র কেড়ে নেওয়া ছাড়া পথ নেই। তবু স্বপ্নে সমস্ত সম্ভব। কবিতায় সমস্ত সম্ভব। ঠিক। সম্ভব। কবিতায় সমস্ত সম্ভব।'

(নিজের জীবন, বীজের জীবন / জয় গোস্বামী /
দেশ, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ / পৃষ্ঠা-৫৮)।

এই একই রচনায় কবি আরও স্বীকার করেছেন যে তিনি কোনো তত্ত্ব শেখেননি, 'অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির উপর নির্ভর করি নিরুপায় হয়ে । পৃথিবীর যে কোনো ঘটনাই আমার অভিজ্ঞতা হতে পারে । যে কোনো মানুষের অনুভূতি আমার হতে পারে ।' এই অনুভূতির জোরেই বলতে পারেন -

"তুমি আমার প্রেমের দিন, তোমাকে হাতে নিয়ে
দাঁড়াব আমি সভায়, পথে, আঘাতে, সম্মানে, সন্ধানে
তোমায় আমি ছুঁইয়ে দেব মরা দিনের গায়ে
খরায় আর অজন্মায়, জড় বধির প্রাণে ।
সূর্যে হাত রাখবে তুমি মাটিজলের মেয়ে
সূর্য জ্ঞান হারাবে ঃ তুমি পারো ? এমন পারো ?
উচ্ছ্বসিত শরীর দুটি আগুন বীজ ধারা
না আমাদের হত্যা করা যাবে না একবারও
আকাশ এসে দাঁড়াবে এই মাটিতে সেই দিন
তুমি তখন ফসল, আমি সকল গ্রামবাসী
তুমি তখন ঢোলক, নাচ, পরব, হোলিখেলা-
তুমি তখন আমার, আমি তোমাকে ভালবাসি ।

('ন হন্যতে' / জয় গোস্বামী / দেশ-
১৪-১১-১৯৮৮)

এই ভালবাসার কথা মনে রেখেই কবির বিনয়নম্র সম্বোধন, 'সুধী পাঠক, স্বীকার করবো এখনো পর্যন্ত সত্যিকার কবিতা দূরে থাক, তার ছায়াকে পর্যন্ত ধরতে পারিনি । হাল ছেড়ে দিইনি তাই ব'লে । মানুষকে তো হারলে চলবে না । সবাই বকাবকি করে ঃ 'যার কিছু হয় না, সে-ই শুধু কবিতা লেখে ।' বেশ । তবু, স্বীকার করতেই হবে, সে তো মাথা তোলবার জন্যেই লেখে । সে তো বেঁচে ওঠবার জন্য লেখে । ভালবাসার জন্য লেখে' ।[১০]

এই ভালবাসার টানেই কবি লেখেন 'আত্মজীবনীর অংশ'-

''কাছে কোথাও বাজ পড়লে ঘুম ভেঙে এখনও যখন
বুবুন চিৎকার করে, 'জয়দা কোথায় ।' যখন এ ঘরে এসে
আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায়
বুঝতে পারি ওই টুকুই আমার পৃথিবী ।
বুঝতে পারি, কবিতাও এর বেশি কিছু আর পারে না ।''

(দেশ, ৪ মে, ১৯৯৯ / পৃষ্ঠা-৫৩)

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, এই নিখাদ, নিঃস্বার্থ ভালবাসা কি শহরে সম্ভব ? ' কবির উত্তর -

''ঘরে বা অফিস ঘরে, পথে রাজপথে, আর চা কফির দোকানে
অবিশ্বাস ঘুরে ঘুরে বেড়ায় শহরে ।
প্রতি প্রতিশ্বাস-অবিশ্বাস ।
আমারও জীবন কাটছে অবিশ্বাসী কবিদের দলে ।''

(বিকেল বেলার কবিতা ঃ জয় গোস্বামী,
দেশ, ৪ মে, ১৯৯৯/পৃষ্ঠা-৫২

কিন্তু কবির গুরুত্ব ছিল কোথায় ?

''আমার গুরুত্ব ছিল মেঘে
প্রাণচিহ্নময় জনপদে
আমার গুরুত্ব ছিল
গা ভরা নতুন শষ্য নিয়ে
রাস্তার দুপাশ থেকে চেয়ে থাকা
আদিগন্ত ক্ষেতে আর মাঠে ।''

তাহলে তো একথা স্বীকার করে নিতে বাধা নেই যে জয় গোস্বামীর কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ ঘটে গ্রামজীবনের মর্মে নিহিত নানা অনুষঙ্গে- যে গুলিকে তিনি ভাষা রূপ দান করেছেন তাঁর কবিতায় -

''দোলের দিন, বিকেল বেলা
সামনে উঠোন, গোয়ালে ঝাঁট দিচ্ছে বুড়ি

জাবনা চিবোয় শান্ত গরু - তারের ওপর
শাড়ির পাশে গামছা মেলা
অস্ত আকাশ সারা গায়ে রং লাগিয়ে
গাছের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছেন ওর
পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গে উঠোন ভ'রে
কুকুর ছানার দৌড় খেলা।''

('বাইশে শ্রাবণের নিবেদন'-জয় গোস্বামী,
দেশ- ৫ আগস্ট, ২০০০)

লোক জগৎকে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে কবি উপস্থাপিত করেন নানা শব্দবন্ধের ব্যবহারে-

''একটা কোঁচবক। দু'টো
ফিঙে যাচ্ছে এদিকের বাবলা বন থেকে ওপারের
বাঁশঝাড়ে। হাতে হাত বেঁধে ঝাড়, গোল গুহাপথ
তৈয়ার করেছে নিচে, ঢালু রাস্তা জলে শেষ হয়।
কাটা কাটা সূর্যালোক মাঝে মধ্যে খুলেছে ফোকর
ঘাট থেকে পায়ে-চলা-পথ উঠে মিলিয়ে চলেছে
আঁকা বাঁকা হয়ে, ছিল, আছে ঘাস জমি ঘুরে
পথ নিজে যাত্রী আহ্।''

('এখানে তোমার মাটিদেশ'-জয় গোস্বামী,
দেশ-৪ এপ্রিল,১৯৯৮)

এই প্রাকৃতিক পরিবেশে কবির

''শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় এই বাবলা গাছের পাশটিতে
শব্দ নেই, শব্দ নেই........ফুল পড়লে শব্দ পাওয়া যায়
পাখি বসলে পাওয়া যায়, এত কাছে লক্ষ করছে না
গায়ের হলুদ রোঁয়া, হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যাবে যেন।

ময়না ঝোপের তলা দিয়ে
বন ধুধুলের লতা কোথায় ত্রিশূণ্যে দোলে,
প্রাচীন শিরিষ গাছে শ্যাওলা ধরা ডালে পরগাছা ।
গুলঞ্চ লতা দোলানো থোলো থোলো বনচালতার
ফল চারিধারে আর সুঁড়ি রাস্তা আম বাগানে শেষ......
ধুলো ধুলো, ঘাস ঘাস, ঘাসপুত্র, ঘাসকন্যাদের
অভিজ্ঞান ।''

অরুণ মিত্র ঃ অরুণ মিত্রের কবিতা প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ একবার লিখেছিলেন, বাইরের কোনো ঠমক নেই, অর্ধমনস্ক পাঠককে কাছে টেনে নেবার মতো কোনো বড় রকমের আড়ম্বর নেই, আছে কেবল কথা বলার একটা মগ্ন স্রোত ।''[১১]

উক্তিটি যে কতদূর সত্য তার প্রমাণ মেলে অরুণ মিত্রের অসংখ্য কবিতায় । 'ভাঙনের মাটি' কবিতায় তিনি লিখেছেন-

''আমাকে নিয়ে তুমি যে স্বপ্ন বোনো
তার কিন্তু সত্যিই কোনো মানেই নেই
কেননা আমার শান্ত ঘরের কাছেই
সমস্ত সময় আদরের মাটির ভাঙন ।
তবে এটাও ঠিক, মাঠ ঘাট যখন ভরে
সোনার রোদে আর পাতারা ফিস ফিস করে,
যখন ঘরের চালে রিমঝিম ঝরে
আকাশ ছোঁওয়া মেঘ নিয়ে শ্রাবণ
আমি তখন মায়াবী চক্করে পড়ি,
দুদণ্ডের কুহক-মাতন,
প্রজাপতিদের নিয়ে ছুটে যেতে চাই
নরম গোধুলির দিকে ।

উপরের পংক্তিগুলি পাঠ করার পর কবি অরুণ মিত্রের বক্তব্য শুনি, 'কারো মুখ চেয়ে আমি কবিতা লিখিনা। না লিখে পারি না বলেই লিখি। আমার স্বর যদি আন্তরিক হয়, আমার অনুভব এবং অভিজ্ঞতার প্রকাশ যদি আমার নিঃশ্বাসের মতো প্রাণ চিহ্ন হয়ে ওঠে তাহলে একদিন মানুষ তা শুনবে।' তখন মনে হয়, অরুণ মিত্রের কবিতা সৃষ্টি উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়, স্বভাব প্রণোদিত। উদ্দেশ্যমূলক কবিতার ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটির কথা স্বীকার করে নিয়েও একথা বলতে পারি। অরুণ মিত্রের কবিতা সৃজনের স্তরে উঠতে পেরেছে এবং স্থানে, কালে ও পাত্রে তার প্রসার সীমাহীন হতে পেরেছে এই কারণে যে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ও মনোভাব তাঁর জীবনানুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে অন্তর-অস্তিত্বের প্রকাশবাহী হয়েছে। কবি যখন লেখেন-

> "এতকাল পরে এই এক রাত এর একেবারে আপন।
> কে একজন একতারা বাজাচ্ছে অন্ধকারে। সেই সুদূরের
> ওপর তোমাদের মুখগুলো একে একে ফুটে উঠছে
> অন্ধকারে। এই রকম স্পষ্ট দ্যাখা কখনো আমি
> দেখিনি আগে। তোমাদের দিকে তাকিয়ে আমার
> চোখ যখন ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল....কারা তোমরা ?.....
> তখন আস্তে আস্তে কেমন অন্য রকম। আস্তে আস্তে
> ছায়া নামছে তোমাদের মুখের ওপর আর আমার
> চেনা-চেনা লাগছে। কতকাল আগে তোমাদের
> দেখেছিলাম, তারপরই আলোর ধাঁধা। এইবার
> তোমাদের চিনতে পারছি। থাকো তোমরা আমার
> অন্ধকারে, মাতো তোমরা প্রিয়ধ্বনিতে মাতো।"

(কবিতা ঃ দ্যাখা, কবি, অরুণ মিত্র,
দেশ- ১৮ জুন, ১৯৯৪ / পৃঃ ৮১)

তখন তিনি লোকজীবনের সঙ্গলাভের জন্য আগ্রহ বোধ করেন, 'কতকাল আগে তোমাদের দেখেছিলাম,... থাকো তোমরা.... প্রিয়ধ্বনিতে মাতো।' মানুষী আবেগ মুছে দিয়ে নয়,

'গুনগুন গানে' কবিতার এই অতীত স্মৃতিচারণ 'মার কোলে শোনা ঘুমপাড়ানি' বহমান কালচেতনার যোগে উপজীব্য হয়েছে। এই কালচেতনা আবার গ্রাম বাংলার চিত্রকল্পে অপরূপ হয়েছে -

তকতকে উঠোন টুপটাপ শিউলি
ঘুম জড়ানো দাওয়ায় যখন আলসে ভোর
তখন আগুন ঝাঁপিয়ে পড়ে গনগনে
সূর্য ফাটে মাথার ওপর
তুবড়ি বাজির ফুল্‌কি ওড়ে চতুর্দিক জুড়ে।

(তদেব)

এই রকম কালচেতনায়, এই রকম অদলবদলে কবি নিজেকে সামিল করেছেন বার বার -

'এই রকম অদলবদলে আছি আমি
গানের মধ্যে হল্‌কার মধ্যে বাঁচার ঘোর নেশায়
আমার অন্তরঙের ভোর দুপুরে।'

(তদেব)

অরুণ মিত্রের কবিতায় যে স্বপ্ন ও বাস্তব একাকার হয়ে যায় তার মূল সুর আশাবাদ। এই Optimism-এর সাথে যুক্ত হয় গ্রাম বাংলার নানা উপাদান- শিউলি ফুল, উঠোন, দাওয়া, একতারা, শান্ত ঘর, আদরের মাটি, সোনা রোদ, মাঠঘাট, মেঘ, শ্রাবণ, গাছের পাতা,, ঘরের চাল।

'কবি সমাজ বদলের স্বপ্নকে শব্দে সাজান। কিন্তু শুধু স্বপ্ন নয়, বর্তমান ও পরিকীর্ণ বাস্তবের দুস্তর বাধা ও বিপত্তি সম্বন্ধেও তিনি সচেতন থাকেন। তাঁকে বলতে শুনি- 'ঘর্মাক্ত হয়ে আমি একের পর এক অবরোধ ভেঙেছি, কথায় চড়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছি' (দিগ্বিজয়)। তাই শুধু স্বপ্নের নয়, প্রবহমান কালের বিস্তীর্ণ প্রেক্ষিতে জীবনের রূপ প্রত্যক্ষ করে তিনি দেখেন যে পুরাতন জীর্ণ বস্তুতে কোনো ঢেউ লাগে কি না। অন্ধকারে থেকে তিনি মুহূর্তগুলোকে দুরন্ত শোভার দিকে এগিয়ে দিতে চান।'[১২]

অরুণ মিত্রের অসংখ্য কবিতায় যে অতীত দিনের স্মৃতিচারণ তা বাংলাদেশের মাটি ও মানুষকে জড়িয়ে ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে।

অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত স্বভাব কবি হয়েও স্বাভাবিক কবি। দেশি ও বিদেশি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মেধাবী অলোক রঞ্জন হৃদয়ে স্বতোৎসারিত আবেগে সংহত রূপ দিতে কবিতা লিখেছেন। নিরন্তর সাধনায় তিনি কবিতার ভাষাকে আয়ত্তে এনেছিলেন। তাঁর কাব্যে নেতিবাদের সুর খুব স্পষ্ট নয়, তিনি দেখেছেন উত্তরণের স্বপ্ন-

''তোমার কাছে আমার নিজের ঘর রয়েছে রাঙা পথের বাঁকে
তুমি তোমার কৌম ধরণ আমায় উপহার দিতে দিতে এগিয়ে যাও,
ঘোমটা কাঁপে, তার ভিতরে নদী,
ডিঙা ভাসছে, দু'পাশ থেকে কাশ ফুলের চারণ-কিশোরেরা,
তোমার হাসি ছুঁতে চাইছে; 'তুমি আমার অস্ট্রিক সভ্যতা।''

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে লেখা 'আমার নতুন বাড়ী' কবিতা (২ ডিসেম্বর, ১৮৮৯ / 'দেশ'-পৃষ্ঠা-১৪) থেকে উদ্ধৃত এই অংশে আমরা শুনি উজ্জীবনের মন্ত্র, শুনি কালের যাত্রার ধ্বনি, 'তুমি আমার অস্ট্রিক সভ্যতা'।

দীর্ঘদিন বিদেশে বসবাসকারী অলোক রঞ্জন যেন এক নীড় প্রত্যাশী পাখি। ঘর বিবাগী এই কবি আজ 'নতুন বাড়ীর' সন্ধান করেন যেখানে ডিঙা, কাশফুল আর চারণ-কিশোরের অস্তিত্ব। এসবের মধ্যেই কবির প্রেম পূর্ণতা পেতে চায় -'তোমার হাসি ছুঁতে চাইছে'। কবির হৃদয় বাংলার গ্রাম পরিবেশে ঘনিষ্ঠ তাপ খুঁজে পেতে চায়। পারিপার্শ্বিক সব কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত হয়ে কবি খুঁজে পেতে চান তাঁর 'নতুন বাড়ী'। অমানিশা অতিক্রম করে কবি তাঁর আত্মার আত্মীয়কে সন্ধান করেন 'অস্ট্রিক সভ্যতার' পার্থিব আশ্রয়ে। এই জগৎকে ভালোবেসেই কবি নীড়-প্রত্যাশী। নাস্তিরূপে তিনি অস্তির সাধক নন বলেই চিরন্তন তাঁর পথ চলা।

অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত কখনোই মনে করেন না যে কবিতা কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু। তিনি জানেন যে কবিতা হল পাঠক এবং কবির মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী পদ্ধতি।

এই পদ্ধতি-কেন্দ্রিক চরিত্রের জন্য কবিতায় ব্যাকরণ, শৈলী এবং নশ্বরতা তৈরী হয়েছে। তিনি আরো জানে, 'প্রতিক্রিয়ার জন্মদাত্রী বলে কবিতায় প্রাণ আরোপিত হয়। প্রসঙ্গত তাঁর 'পূজা-আর্চা' কবিতাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে -

''খুঁটির গায়ে আড়বাঁধা, বাঁশ ঘুরপাক খায় তাতে...
রাঢ়ের পুরুষ দেবতাদের যে সব প্রতিনিধি
যোগ দিয়েছে, তাদের ভিতর শনাক্ত করলাম
পাউরি এবং বাগাল্যা আর ভিরকুনাথের মুখ;
এবার নারীর দলটা ভারি, ঘাঘরবুড়ি থেকে
সোনামুখী, উখড়াকুঁওরী-সবাই এসে গেছে
ইদলবাটি কুড়মিঠা আর ছোট বৈনান হয়ে
আসতে গিয়ে আরও কজন লৌকিক দেবদেবী
আটকে গেছে অটো-রিকশা পাওয়া যায়নি বলে,
ভিড় তবু মন্দ না।''

(দেশ ঃ ১৭ অক্টোবর, ১৯৯৮ / পৃষ্ঠা-২৮)

কবি অলোক রঞ্জন যে রাঢ় অঞ্চলের প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় এনেছেন ভৌগোলিক দৃষ্টিতে তার স্পষ্টত দুটি ভাগ- (ক) পশ্চিমাঞ্চল- সমগ্র পুরুলিয়া, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলা, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ, বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশের দুর্গাপুর, আসানসোল অঞ্চল। এ হল 'বৃহত্তর পশ্চিম রাঢ়ভূমি' (খ) পূর্বাঞ্চল - দূর্গাপুরাদি বাদে বর্ধমান জেলা, সমগ্র হুগলী জেলা ও মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব দক্ষিণাংশ মিলিয়ে আরেক ভূখণ্ড। এ হল বৃহত্তর পূর্ব রাঢ় ভূমি।

পাউরি, বাগাল্যা, ভিরখুনাথ - এরা রাঢ়ভূমির লাল, শুকনো, কাঁকুরে কল্লা মাটি, টিলা - মালভূমি, ডুংরি - দাড়াং বনজঙ্গল, ঝোপঝাড়, কাঁটা আর পাহাড়ও নদীর সাথে যুক্ত। এখানকার সর্বত্র পথঘাট নেই। তাই, অটো-রিকশা পাওয়া যায় নি। আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা এখনো ঢুকতে পারে নি অনেক স্থানেই। আদিম অস্ত্রাল জাতি অধ্যুষিত এই

এলাকা। তাই কবি অলোক রঞ্জন এখানে দেখেন খুঁটির গায়ে আড়বাঁধা বাঁশে ঘুরপাক খাওয়া 'গাজন সন্ন্যাসিনীকে'। এই রাঢ় অঞ্চলের উপজাতি লোক আলোচ্য কবিতায় স্থান পেয়েছে - যাদের অধিকাংশের শিক্ষা নেই, খাদ্য নেই, উপযুক্ত আবাস নেই, জীবন যাপনের তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। অধিকাংশই দিনমজুর। কায়ক্লেশে সারাদিন পরিশ্রম করে যা পায়, কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালায়। এই উপজাতিদের গ্রাম্য দেবদেবী, পুজোপার্বন, বারব্রত, ধর্ম-কর্ম প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে অলোক রঞ্জন দাস গুপ্তের কবিতায়।

অলোক রঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় কবি ও পাঠকসত্তা সময় নিরপেক্ষ নয়। এই দুই সত্তায় মিলিত হয় ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন- এক কথায় গোটা পরিসর। অলোক রঞ্জন যে পাঠকৃতির জন্ম দেন, পাঠক সেটিকে নিজস্ব চেতনার আলোকে নতুন ভাবে তাৎপর্যময় করে তোলেন। এই তাৎপর্যের স্বরূপ নির্ভর করে পাঠক কোন্ প্রসঙ্গে পাঠকৃতিটিকে স্থাপন করলেন তার ওপর। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণের ব্যাপারটি যখন এসে যায় তখন স্বীকার করে নিতে হয়, প্রেক্ষিত ছাড়া সত্য নেই, প্রসঙ্গ ছাড়া পাঠকৃতি নেই। এই প্রসঙ্গ আবার কবি পাঠক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। অলোক রঞ্জনের কবিসত্তা যেহেতু সময় পরিসর শুণ্য নয় তাই তাঁর কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যুগ-ভাব ও ভাবনা, নব্য-আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক চিন্তা ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ইংগিতময় মনন প্রকরণ। তাঁর একটি কবিতা 'তৃতীয় বর্ণের টানে' দেখি-

''গুণবৃক্ষ কাকে বলে তুমি জানো ?
যে-মাস্তুলে গুণ বেঁধে নৌকো টানা হয়
তারই নাম গুণবৃক্ষ।
'গুধড়ি' শব্দের মানে ফকিরের ছন্নছেঁড়া কাঁথা,
গূঢ় এই তথ্য আমি কাউকে না জানিয়ে সে-শব্দের
অভ্যন্তরে গুঁড়ি মেরে নিশ্চিন্ত ছিলাম।
না, প্রদর্শিত বিশ্বাসের কোনও
আদিখ্যেতা আদপেই পছন্দ করি না, আমি শুধু
গহন দুয়েকটা শব্দ প্রবর্তন করে অতর্কিতে

সুরে যেতে চাই, যেন প্রচলিত ধ্যান ধারণার
জীবন্মৃত দশা মানুষি মুক্তির স্বাদ পায়।

(দেশ ঃ ২৯ নভেম্বর, ১৯৯৭ / পৃষ্ঠা-২৮)

এখানে স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ নয়, 'শব্দের অভ্যন্তরে গুঁড়ি মেরে' কবি নিশ্চিন্ত থাকেন। শব্দের মধ্য দিয়ে কবি ভাষার প্রাকৃতিক গুণের সন্ধান পান এবং পৃথিবীর অনেক কিছুই ধরাছোঁয়ার মধ্যে পান, স্থির ছবিগুলোকে শব্দের পায়ে দাঁড় করিয়ে সচল করতে চান।

তসলিমা নাসরিন ঃ রক্ত, জল ও তমসা চিরে শরীরে যে প্রাণ আসে তাকে ব্যক্ত করার জন্যে তসলিমা কবিতাকে বেছে নিয়েছেন। একাকীত্ব, অসহায়তা, মর্মন্তুদ হাহাকার, ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের টানাপোড়ন, অনন্বয় এবং মানুষের প্রতি প্রবল আস্থা-এই প্রেক্ষাপটে তসলিমা নাসরিনের কাছে তৈরি হয় কবিতার মুহূর্ত। অনেক পেয়েছেন তিনি - মুগ্ধ মানুষের হাততালি, প্যারিসে - স্টারস্‌বুর্গে-মারসেইয়ে-নানতে মাথার মুকুটে অনেক পালক পেয়েছেন তিনি। জুরিখে, বার্ণে, বারসেলোনায় রাজা-মন্ত্রীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সোনার মেডেল পেয়েছেন, 'গোল্ডেন বুক'-এ সই করেছেন। ট্রডহেম, স্টাভাংগার, অসলো, স্টকহোম, গোথমবার্গে অনেক ফুলের ঘ্রাণ তিনি নিয়েছেন। হেলসিংকি, প্রাগ, কারলোভি ভেরিতে পেয়েছেন অনেক উপঢৌকন। কিন্তু তিনি আসলে যা চেয়েছেন তাহল-

"বাড়ির দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসে উঠোনের কাক তাড়াতে তাড়াতে
নুন লংকা মেখে পান্তা খাব, খেয়ে তবক দেওয়া পান।
ধনেখালি শাড়ি পরে কাগজি লেবুর, কামিনী ফুলের,
মাচার লাউয়ের, বকনা বাছুরের, খলসে মাছের,
পাঁচফোড়নের গল্প শোনাতে শোনাতে
মা আমার হাতপাখায় বাতাস করবে আর তাঁর গায়ের ঘাম থেকে
তীব্র ভেসে আসবে জন্মের, শৈশবের, কৈশোরের
গোল্লাছুটের ঘ্রাণ।
অনেক তো হল মহাসাগরে সাঁতার,

এবার গ্রামের পুকুরে ভরদুপুরে দুটো ডুব দেব নিখিলদা,
(বাড়ি ফিরব / তসলিমা নাসরিন, দেশ,
১৯ ফেব্রুয়ারি / পৃষ্ঠা-২৯)

কবি তসলিমা নিজেকে বারবার প্রশ্ন করেছেন, 'আমার কি নিজের কোন দেশ আছে আদৌ ? নিজের কোনও শহর বা গ্রাম ? নিজের কোনও ঘর ? নিজের কোনও শরীর বা হৃদয় ?'

যে নির্মম জীবন-যন্ত্রণা থেকে এই প্রশ্ন 'রং বদল' কবিতায় তসলিমা তা ব্যক্ত করেছেন-

"…..এক দেশ থেকে আরেক দেশে ভাসছি,
এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে, এক আকাশ থেকে
আরেক আকাশ, এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রে
ভাসতে ভাসতে একদিন শেষরাতে অথবা মাঝ দুপুরে
কোথায় ভিড়বে আমার জীবন ?

এর উত্তর কবির অজানা নয়-

"হু হু শুণ্যতা আমাকে কামড়ে ধরবে,
ঝরে যাব, ডুবে ডাব সাদা কাফনে
তিন হাত গভীর গর্তে ।"
(রং বদল / তসলিমা নাসরিন,
দেশ ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫)

শুণ্যতায় মিলিয়ে যাবার আগে কবি তাই ফিরে পেতে চান তাঁর সাধের গ্রাম বাংলাকে-

এখনও ফেরাও আমাকে ।
এখনও আমাকে ধুলোবালি, নদী হাওর,
সরষে ক্ষেত আর ব্রহ্মপুত্র দাও ।
এখনও দাও কলকাতা, নিকোনো উঠোন,
হাতপাখার হাওয়া, টিনের চালের রিমঝিম,
ব্যাং আর ঝিঁঝির ডাকের গোটা বর্ষা,

ধোঁয়া-ওঠা ভাতে মাগুর মাছের ধনেপাতা ঝোল।

(ফেরাও ঃ তসলিমা নাসরিন, দেশ ঃ ৯.০২.১৯৯৫)

এমন বাদল দিনে কবি তসলিমার মনে পড়ে-

''দুফোঁটা বৃষ্টি ঝরলেই, আকাশ মেঘলা হলেই
বাড়িতে ধুম পড়ত সুখের।
সারাদিন হইহই রইরই, গল্প জমে উঠত ঠাকুরমার ঝুলির,
কেউ গলা ছেড়ে গাইত বর্ষার গান,
কেউ কেউ বসে যেত গরম বাদাম, ঝালমুড়ি,
ধোঁয়াওঠা চা, তাস কিংবা বাগাডুলি হাতে
কেউ আবার সুড়সুড় নেমে পড়ত উঠোনের বৃষ্টিতে-
ভুনো খিচুড়ি আর ভাজা ইলিশের গন্ধে ম-ম করত বাড়ি।

(এমন বাদল দিনে / তসলিমা নাসরিন,
দেশ ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫)

আজ কবি বড় একা। তিনি সব কিছু ফেলে এসেছেন তাঁর প্রিয় বাংলাদেশে। ফেলে এসেছেন ধু-ধু মাঠ, আম-কাঁঠালের বন, লিচু তলা, ঘিঞ্জি গলি, বস্তি, ডোবা। আর ফেলে এসেছেন দোলনচাঁপার সাথে 'একটি হৃদয়'। শীতের আগমনে তসলিমার মনে পড়ে-

''শীত আসছে, উঠোনে শীতল পাটি বিছিয়ে
এখন লেপ রোদে দেবার সময়।
মা আমার লেপ কম্বল রোদে দিচ্ছেন,
ওশার লাগাচ্ছেন, কোল বালিশে তুলো ভরছেন
উঠোনে তুলো ধুনচে ধুনচিরা......
এবারের শীতেও ভাপা পিঠে বানাবার
হাঁড়ি ন্যাকড়া জোগাড় করছেন।
মা কি আগামী শীতেও আমার জন্য আবার
রোদে দেবেন আম বা জলপাইয়ের আচার, লেপতোশক

আর দরজায় টোকা পড়লে বটিতে মাছ রেখেই

দৌড়ে দেখবেন আমি কি না !

(মা, এবারের শীতে / তসলিমা নাসরিন,

রচনাকাল- প্রকাশকাল ঃ ১১.০২.১৯৯৫, দেশ/পৃষ্ঠা-২৬)

তসলিমা নাসরিনের কবিতাতেই তাঁর আত্ম উন্মোচন। তিনি তাঁর কবিতায় উপস্থাপন ও আত্মনির্মাণের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। কবি তাঁর জীবনের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে অন্বেষণ করেন নিজেকে। গদ্যকার তসলিমাকে নয়, কবি তসলিমাকে আমাদের মনে হয় তিনি খুব অসহায়। প্রিয় মাতৃভূমির স্মৃতি তাঁকে বা বার মনে করিয়ে দেয়, তিনি পৃথিবীতে এসে হারিয়ে গেছেন, অনেক রাত হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না ঘরে ফেরার রাস্তা। কোথায় তাঁর ঘর, কে তাঁকে হাতছানি দেয় বার বার, কোথায় চলেছেন তিনি- একা, নিঃসঙ্গ। ভাবতে ভাবতে উঠে আসে গ্রাম বাংলার অসংখ্য লৌকিক উপাদান - শীতল পাটি, আচার, ঝালমুড়ি, খিচুড়ি, আম-কাঁঠালের বন, লিচু তলা, ঘুড়ি, পুকুর পাড়। উঠে আসে একটার পর একটা মুখ, ঘটনা, ছেঁড়া সুর, ছেঁড়া গান। এসব কিছুই ধাক্কা মারে তসলিমার বোধের দরজায়। আর তখনি তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয় কবিতার মুহূর্ত।

তসলিমার কবিতা তসলিমার আত্মকথন বলেই মনে হয় আমার। মৃত্যুর পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে, ধ্বংসের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে প্রতি মুহূর্তে নিজের সঙ্গে নিজের যে অন্তর-সংলাপ, যে আত্মজিজ্ঞাসা তার বহু ভগ্নাংশকে তিনি রূপ দিয়েছেন কবিতায়। তসলিমার কবিতায় সামাজিক দায়বদ্ধতার অন্বেষণ নিরর্থক। কারণ তাঁর কবিতা পূর্ণতা পায় তারই দুঃখ-ব্যথা, ক্রোধ, শিহরণ, বেঁচে থাকা না থাকার প্রতি মুহূর্ত নিয়ে।

শ্রী জাত ঃ আধুনিক কবিতা বা কবিতায় আধুনিকতা সমার্থক ধরে নিয়েই বলছি, সমকালের হয়েও শ্রী জাতের কবিতা কালোত্তীর্ণ। প্রকৃত অর্থেই তাঁর কবিতাকে আধুনিক কবিতা বলা যায়। তাঁর কবিতায় যে যুগ-যন্ত্রণার কথা ধরা পড়েছে তা কালোত্তীর্ণতার সীমা অতিক্রম করেছে। সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে কবিমানসের যে টানাপোড়েন, শ্রী জাতের অনেক কবিতায় তার সফল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই

টানাপোড়েন সত্ত্বেও কবি একটি প্রত্যয়ে সুস্থির-জীবন-নদীর চলা অব্যাহত। যে কৃষি সভ্যতার উত্তরাধিকারী কবি, তার পরিবর্তন আছে, কিন্তু মৃত্যু নেই। সেই দেশ, সেই যুঁই ফুল, সেই গভীর ধান নিয়েই মানুষ বার বার পাতবে সংসার। কারণ মানুষের মরণ নেই, মানুষের চলা থেমে থাকে না।

"কখনও ছেঁড়াদেশ, ছোট্ট মন, জুঁই, গভীর ধান,
এই সব আসবেই, শেষে তো চেনালোক পাতবে সংসার
জীবনবাস.......
বেশ তাই হোক আজ।"

(কবিতাঃ ফুলচোর / দেশ ঃ ১৫.০৪.২০০০)

যে জগতে কবি শ্রীজাত বিচরণ করেন, সেই আবেষ্টনের মধ্যে থেকেই তিনি আবেগের দুর্মর আতিশয্যে স্বীয় উপলব্ধিকে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশ ছন্দোময় শব্দ যোগে সার্থক হয়েছে বার বার। তিনি শুধু কবিচিত্তের সংরাগকে প্রকাশ করে শাশ্বত বাণীমূর্ত্তি রচনা করেন নি, অনুভূতি-উপলব্ধি-অভিজ্ঞতা-প্রতিবেদনের কোরক -বিকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর কবিতায়। একটি উদাহরণ-

"এক... দুই...তিন...চার স্তবকও খুলে নিই।
ফুল তো শষ্যের পরের পাঠ,
বার বার একজন কাঁদিয়ে চলে যায়,
ঝাপসা আয়নায় বিশাল মাঠ ....
সেই মাঠ পার হই।
চারদিক নিঃঝুম, এদিকে আমি চুপ, ক্লান্ত দিন
আর সে আয়নায়
চইচই...চইচই... কে যেন ডেকে যায়, অভ্রসুন্দর সফেদ হাঁস
তার সঙ্গে ছোপ্ ছোপ্ অমলতাস....
এও এক সত্যি।"

(একদিন ভাবতাম / দেশ ঃ ১৫ এপ্রিল, ২০০০)

শ্রী জাত-এর কবিতায় এমন এক আশ্চর্য 'অবলোকন' রয়েছে যা পরিদৃশ্যমান এই বস্তু জগৎ ছাপিয়ে চকিতে ছুঁয়ে যায় আত্মার এপিঠ-ওপিঠ। এই সুখ-দুঃখময়, এই কাতর-যন্ত্রণাময়-সংঘাত মুখর, পঙ্কিলতাকীর্ণ জীবনের মধ্যে কবি খুঁজে বেড়ান স্বপ্ন-সৌন্দর্য -

"গাছেরা কথা দেয়, ভুলতে চায় সব ধুসর দিন,
এই স্বপ্নের খাতিরে বেঁচে থাক।

('একদিন ভাবতাম'/ তদেব)

ঘটনা বা পরিবেশ কেন্দ্রিক কিছু উপাদান বিভিন্ন সময়ে সঞ্চিত হয়ে থাকে শ্রী জাত-এর চেতনা বা উপলব্ধির স্তরে। জনসমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোন এক মুহূর্তে তা শব্দের জল-মাটি-রোদ নিয়ে কবিতার অঙ্কুর হয়ে বেরিয়ে আসে। সেক্ষেত্রে কবিতার আঙ্গিক তাঁর কাছে জরুরী হয়ে দেখা দেয় অন্যান্য শিল্পাঙ্গিকের বিশেষ মূল্যের মতোই। অথচ আঙ্গিকের সঙ্গে বিশুদ্ধ-নিরেট-বক্তব্যময় আবেগ পার্বতী-পরমেশ্বরের মতোই শ্রী জাত-এর কবিতায় অন্বিত হয়। তাঁর কবিতায় অবাঞ্ছিত জটিলতা নেই, বাক্যের ব্যায়াম প্রদর্শন নেই। তাঁর কবিসত্তা আজন্ম -অর্জিত, কবিতার ক্লাসে পরিশীলিত নয়। শ্রী জাত -এর কবিতা প্রকৃত পক্ষে এক শুদ্ধ শিল্প যা জীবনকে ছুঁয়ে থাকে অনুক্ষণ। আর এই হল শ্রী জাত-এর কবিতার দর্শন বা Philosophy.

শ্রী জাত-এর কবিতা জটিল শব্দ এবং বক্তব্যের ধ্বংসাত্মক কৌশলে নির্মিত নয়। ফলে তাঁর কবিতার সাথে পাঠকের সেতু বন্ধন রচিত হয় স্বল্পায়াসে, কখনো অনায়াসে। নিজস্ব শুদ্ধতার সার্বিক গরজে তিনি তাঁর কাব্য সৃষ্টিকে বিশুদ্ধ করে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যান নিজের সমতায়। কবি যখন বলেন -

"ওই মুখ থাকবেই,
থাকবে ঝলমল্ সে আয়নাও....."

('একদিন ভাবতাম' তদেব)

তখন তাঁর চেতনা, জীবনবোধ, হৃদয়াভূতি, দ্বন্দ্ব, স্বপ্ন, প্রেম, আত্মনির্ণয় একাকার হয়ে যায় কবি ধর্মের সাথে। এইখানেই শ্রী জাতের কবিতা কালজয়ী। তাঁর অনেক কবিতায় কবিচেতনার যে স্বাভাবিক সংযোগ ঘটেছে তা চিরকাল মানুষকে ছুঁয়ে যাবে, মানুষের হয়ে থাকবে সত্য, সুন্দর ও অনিবার্য।

কৃষ্ণা বসু ঃ কৃষ্ণা বসু একবার বলেছিলেন, 'ব্যস্ত সমাজের থেকে কবিতার নির্বাসিন হয়ে গেছে কবে। সফল ও সুখী মানুষেরা আজকাল কবিতার ধারও ধারে না, তারা সকলেই সবকিছু বোঝে, বোঝে জীবনবীমার গল্প, বোঝে হাসিখুশি, সুড়সুড়ি-মাখা, টিভি সিরিয়াল, ঝোপ বুঝে কোপ মারা, হর্ষদ মেহেতা, বোঝে কতখানি ধান থেকে জন্ম নেয় কতখানি চাল, শুধু কবিতা বোঝে না। বোঝে না যে তার জন্য লজ্জা নেই কোনও, সুপ্রাচীন, সুতীব্র, আর্তিতে ভরা মায়াবী শিল্পের দিক থেকে সম্পূর্ণ পিঠ ফিরিয়ে বেশ আছে সুসভ্য প্রজাতি।'[১৩]

কিন্তু এই নেতিবাদী ভাবনায় কবি স্থির থাকতে পারেননি বলেই লিখেছেন-

"মাঝে মাঝে খুবই নির্জনে কোনও এক পবিত্র মুহূর্তে
প্রাণের ভিতর বেজে ওঠে বাঁশি, অলৌকিক সেই বাঁশি,
রন্ধনে বাসনে ব্যস্ত সুখী গৃহকোন কেঁপে ওঠে,
সমস্ত হৃদয় জুড়ে কোটালের বান ডাকে
কবিতার অসম্ভব বীজগুলি প্রতিশোধ নেয়
সব কিছু সমস্ত অর্জন সুখ-স্বস্তি-সচ্ছলতা
অর্থহীন মনে হয়।
বাঁশি ডাকে, বাঁশি বাজে, সেই বাঁশি বাজে,
জীবন আচ্ছন্ন করা বাঁশি বাজে যমুনা পুলিনে।"

('অলৌকিক প্রতিশোধ;-কৃষ্ণা বসু, দেশ,
৩১ অক্টোবর, ১৯৯৮)

মানুষের জীবন কবিতার কাছে অনেক কিছুই দাবী করতে পারে। দিন যাপনের গ্লানির মধ্যে ফুলের মতো ফোটা একটি কবিতার জন্য মানুষ অপেক্ষা করতেই পারে। যদি না পারে তাতে কাব্যশিল্পের রহস্য সৌন্দর্য ভাণ্ডারের কিছু আসে যায় না। ক্ষতি হতে পারে শুধুমাত্র জীবনেরই। কৃষ্ণা বসু এই প্রত্যয়ে ছিলেন সুস্থির। বহিরঙ্গের আলিম্পনে, অন্তরের শোণিত প্রবাহে, ইচ্ছার পালে হাওয়ায় ধাক্কা লেগে বাংলা কাব্য সাহিত্যের আকাশ ফুটে উঠেছে কৃষ্ণা বসুর কবিতা-নক্ষত্র। কবি তাঁর কবিতার

অন্তরালেই দাঁড়িয়ে থাকেন। যেহেতু তিনি মানুষ, সেহেতু পাঠকের মনোযোগ তাঁর আকাঙ্কার মধ্যে থাকতেই পারে। কবি কৃষ্ণা বসুর অভিজ্ঞতার, স্বপ্নের, মন খারাপের জগতের যন্ত্রণা থেকে উৎসারিত শব্দ মানুষকে প্রতিকূল অবস্থার আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শেখায়। কবিতা সৃষ্টির নান্দনিক কর্মকাণ্ডের পেছনে সময় ও শ্রম ঢেলে দুঃসাহসিক আলোর পথে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণায় কৃষ্ণা বসু লেখেন -

"বাগানে রয়েছে ঢের অমূল-কুসুম,
একটি নদীও আছে বাড়ীর পশ্চিমে,
ঠিক নদী নয়, যেন স্বর্গীয় প্রপাত।
সেই প্রপাতের পাশে নার্সিসাস ফুটে আছে একা
এরকম ঘরবাড়ি নিজেই করেছি আমি,
বাগান দিয়েছি নিজে, বৃক্ষগুলি,
বৃক্ষের কোটর, প্রাচীন পেঁচাটি আছে তার মধ্যে,
পাতাগুলি ঘির আছে লাবণ্য কুসুম।"

(আমার আবাস / কৃষ্ণা বসু, দেশ,
১৯ সেপ্টেম্বর,১৯৮৭)

কৃষ্ণা বসুর অনেক কবিতায় লোকায়ত অনুষঙ্গের সাবলীল ব্যবহার রয়েছে। তাঁর কবিতায় আমরা খুঁজে পাই বাগান, কুসুম, নদী, বাড়ি, বৃক্ষকোটর, প্রাচীন পেঁচা, পাতা ইত্যাদি। এই কবির কাছে কলকাতা মহানগরীর আকর্ষণ কেমন তা কবির লেখনিতেই ফুটে উঠেছে -

"ও কোলকাতা, কোনখানে প্রাণ, কোনখানে তোর জোর ?
হাজার হাতে ডাকিস কেন, মাথায় ঘনঘোর।
তোর কাছে মন খুঁজতে এসে দারুণ ঠকেছি,
আশিরনখ শরীর যে তোর কোলকাতা তুই কী ?"

(মহানাগরিক গান / কৃষ্ণা বসু, দেশ,
২৯ নভেম্বর, ১৯৯৭ / পৃষ্ঠা- ৩২

এই কলকাতার মহানাগরিক নিষ্ঠুরতায় কবি মাঝে মাঝে তসলিমা নাসরিনের মতো

একাকীত্ব বোধ করেন, নিঃসঙ্গতা কবিকে পীড়া দেয় -

"একা থাকি, একা থাকি, একা একা থাকি,
কতদিন একা থাকা যায় ?

(সমাজে প্রান্তিক নারী / কৃষ্ণা বসু, আজকাল /
শারদ সংখ্যা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ / পৃষ্ঠা - ৩৩১)

কৃষ্ণা বসুর কবিতায় নগর-কেন্দ্রিকতার চেয়ে প্রাক্তায়নের প্রাধান্যই বেশি চোখে পড়ে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ঃ কবি হিশেবে সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কাছে রয়েছে তাঁর শৈশব, বয়ঃসন্ধি, বয়স্কের মানসিক প্রসার, প্রেম বা জীবনের দাবি, কিংবা জীবনেরই অসংগতির, দুঃখের, চেতন-অবচেতনে মৃত্যুরও দ্যোতনা, ব্যক্তিস্বরূপের আঁলো-আধারি, কিংবা প্রতি মুহূর্তে পতন ও পুনরুত্থানের বোধ, স্মৃতি, সময় প্রবাহবামানতা। নিজের জীবনে যা ঘটেছে সেই সব ব্যাপারকে সাক্ষী হিশেবে লিপিবদ্ধ করেছেন কবি। তাঁর অসংখ্য কবিতা পাঠ করে মনে হয়েছে তিনি জীবনে দুঃখ-কষ্ট কম ভোগ করেন নি। এই লেখাগুলো নশ্বরতা বা চিরকালীনতা লাভ করবে কিনা তা ঘোষণা করবে ভাবীকাল। তাঁর কবিতায় একদিকে আছে শূণ্যতা-অশ্রু, অন্যদিকে আছে সৌন্দর্য ও বিমূর্ততা। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত আস্তিত্বিক প্রশ্নে আলোড়িত হয়েই কবিতা লিখেছেন-

"যে দিকে তাকাই দেখি দেশ ক্রমে হয়ে যাচ্ছে রোগা, ব্যথা,
এত ব্যথা যাতে মৃত্যুও দুঃখিত হয়,-ভবিষ্যহীন ভূত
আমি, তবু আমিই লিখছি চিতার অচেনা এতকথা।"

(অগ্রদানীর জবানী / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত,
দেশ, ১৩ জুন, ১৯৯৮ / পৃষ্ঠা - ৭৫)

এই আলোড়ন সারা জীবন ধরে বহন করেছেন কবি। নানা ধরণের বিভ্রান্তি থেকে, দৃশ্য ও জিজ্ঞাসা থেকে, উৎসব ও অজ্ঞানতা থেকে, নারী ও শুণ্যতা থেকে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কবিতা লেখার উৎসাহ পেয়েছেন। কবি তাঁর সময়, তাঁর জীবন ও তাঁর পরিপার্শ্ব থেকে কবিতার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। যা তিনি ভাবেন, যা তাঁর

বোধে আসে, নির্ভয় ভাবে কবিতায় তা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন কবি সমরেন্দ্র। তাঁর অধিকাংশ কবিতা জানান দেয়, কবি আছেন মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে-কবিতার গোপন রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে। প্রকৃত অর্থেই তিনি সমাজ মনস্ক কবি। রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং বিপর্যয়ের বিষয়কেও তিনি কাব্য-কবিতায় স্থান দিয়েছেন। পারিপার্শ্বিক জগৎ কবিকে আর্ত করেছে। সত্তরের দশকে মুক্তি যুদ্ধের কালপর্বের অস্থিরতা কবিকে সঙ্গত কারণেই স্পর্শ করেছিল। তাই তিনি শুধু বিকৃত সমাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এইভাবে-

"ছোট চোরের জেল হয়, বড় চোরের হয় না কিছুই,
তারা বারংবার রং বদলায়, জনগণের সই নিয়ে
পার্লামেন্টে এসে টেবিল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে
একমাত্র তারাই নাকি অতি ভালবেসে দিয়ে যাবে
আসমুদ্র হিমাচলকে পাহারা।"

(তদেব)

তবে মাঝে মাঝে সমসাময়িকতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে কবি অনুভব করেছেন গ্রাম-প্রকৃতির ধ্রুবসুর। তাঁর ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে, 'আমাদের বেঁচে থাকার সঙ্গে সহজ সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশের.... একটি অমোঘ ভূমিকা আছে, পৃথিবী থেকে ব্যাপক বৃক্ষ বিচ্ছেদ ও পরিবেশ দূষণের কারণে আমরা ক্রমশই এই ভয়াবহ বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছি। ১৯৯২ সালে লেখা 'গাছ মানুষ' কাব্যগ্রন্থে তিনি এর প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছেন -

"শুধু আমি শ্মশানে এক পা রেখে
যে কোন গাছের শীর্ষে ফুল হয়ে ফুটি,
তারপর ধুলোর তুলনা হই।

(কাব্য ঃ 'গাছ মানুষ' কবিতা ঃ তুলনামূলক)

সমরেন্দ্রের কবিতায় নিসর্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পায় প্রথমাবধি। তাঁর স্মৃতিরোমন্থন মূলক একটি কবিতা 'বাসা বদল' প্রসঙ্গে রবিন পাল বলেন, 'মহাযুদ্ধের পরে বাবার তৈরি বাড়ি, তার নিসর্গ আবহ, বাড়ির কাজের লোকজন প্রভৃতি সজ্ঞান নস্টালজিয়া বর্তমান জীবনকে নির্বাসন প্রতিপন্ন করে।[১৪]

গ্রাম বাংলার জীবনের প্রতি তাঁর বিশ্বাস কতখানি আন্তরিক তার প্রমাণ মেলে 'দহ আছে দিঘি নেই' কবিতায়-

"ওই শিশুটি আমার, তাকে কোলকাতা কান্তার থেকে
দূর দূর দূরে নিতে চাই।
একদিন কংক্রিটভারে এ শহরে মহা ভূমিকম্প হবে
অসুখে ছারখার হয়ে সব হবে শব।
ক্রোধে, ক্ষোভে, কিছু না হবার দুঃখে
আজ একার প্রগাঢ় অন্যায়ে যাচ্ছি মরে
এই বোধবুদ্ধিহীন পাথর মাথার ধিক্কার শহরে।"

(কাব্য ঃ একা, এই বর্ষাবিষন্ন দেশে,
রচনাকাল ঃ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ)

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন 'একবচন বহুবচন' (১৯৯৩)। এই কাব্যের কয়েকটি কবিতায় আছে স্বদেশ বিষয়ক ধারণা। কবিতাগুলি হল 'এখন স্বদেশ', 'এ বাড়িটা কার', 'জয়হরি মণ্ডলের গল্প', 'হরিনাথ' ইত্যাদি। এগুলি স্মৃতি সঞ্জীবিত কবিতা। কবিতাগুলি অতিকথনভারে পীড়িত নয়, বরং 'নস্টালজিক বেদনার' সুন্দর শিল্পায়ন এগুলি। ১৯৯৭ সালের ২৭ নভেম্বর তারিখে 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'আবার যখের ধন' কবিতায় পাই একাধিক লোকায়ত অনুষঙ্গ-

"এই গহন রাত্রে চারিদিকে গভীর বন, আকাশ তার
তাবৎ নক্ষত্র গাছ গাছালির মাথায় উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে,
কাছেই একটা রোগা নদীও খুব মৃদু জল বাজাচ্ছে।
মেঘের আধ খাওয়া জ্যোৎস্না এসে পাশে শুয়ে আছে,
বেশ খানিকক্ষণ তাকে যত্ন আদর করে বলেছি আজকে
এই অবধি ।"

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতায় এই যে চিত্রময়তা তা আমাদের মন ছুঁয়ে যায়। তিনি এক

বলেছিলেন যে কবিতা তাঁর প্রিয়, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় দেশ তার প্রিয়। (বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা / সম্পাদনা, সুবল সামন্ত . পৃষ্ঠা-২৮৫/ ২য় খন্ড)। ২০০১ সালে লেখা কাব্যগ্রন্থ 'দুই নগরী'র ঢাকা বিষয়ক ১৮ টি কবিতা পড়লে মনে হয়, এই কাব্যের শুরুতে কবি যা বলেছেন তার একবর্ণও মিথ্যা নয়, 'ঢাকা আমার জন্ম জীবনের ধাত্রী, ঢাকার মাটি আমার জননী মৃত্তিকা।'

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় এপার বাংলার আরও অনেক কবি দেশিয় ইতিহাস, লোকায়ত সাহিত্য, গ্রাম জীবন ও লোকসংস্কৃতির অসংখ্য অনুষঙ্গের ব্যবহারে আত্মদীপালোক প্রজ্জ্বলিত করেছেন। কবি রত্নেশ্বর হাজরা বলেন, কতগুলো মৌল বোধের স্পর্শ থাকে আমার কবিতায়। প্রভাবিত হই সবুজ থেকে, গাছের ছায়া থেকে, জল আর আকাশের সীমাহীন রহস্য থেকে, প্রাত্যহিক জীবন, মানুষ এবং তাদের ব্যবহার থেকে।[১৫] কবির এই উক্তির সত্যতা মেলে 'উপকরণ'-এর মত অসংখ্য কবিতায় -

''এই নাও চকমকি এই নাও শুকনো ভোজপাতা
আদিবাসী সন্ধ্যাকাল বুনো শব্দ, জংলি আবহাওয়া
এই নাও নাচগান, লাক্ষা -মোম-মশালের তুলো
এক গণ্ডুষ দিশি মদ।

(দেশ, ২৮ জুন, ১৯৯৯ / পৃষ্ঠা -৮০)

অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় রয়েছে লোকায়ত জীবনের স্পন্দন ও লোক প্রকরণের আত্মীকরণ -

''শীতকালে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে-
বালাপোশ জড়িয়ে ঠাকুমা কাঁথায় নকশা তুলছে
রোদে পিঠ রেখে ভাইবোনদের নামতা পড়া
লাউমাচার নিচে খুব রোদ-মা সেখানে বসে বড়ি দিচ্ছে।''[১৬]

এ সব কিছুর থেকে ছিন্ন হয়ে যাওয়ার গভীর বেদনায় কবি লেখেন -

''ধুলো জমতে জমতে কখন যে বিবর্ণ হয়ে গেল সেই সব ছবি
শীতের রোদ্দুর কত বিমর্ষ হয়ে পড়েছে এখন।''[১৭]

গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন চর্চা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এই কবির কবিতায় মাটির সুরে মাটির ভাষা যে কতখানি জীবন্ত হয়েছে তা ১৯৭১-এ লেখা 'মাঠ-পাথরের গান' কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করলেই বোঝা যায়।

কবি রাম বসুকে ভীষণভাবে অভিভুত করেছিল তাঁর জন্মভূমি চব্বিশ পরগনার তার গুনিয়া গ্রাম। কপোতাক্ষের তীরবর্তী সাগরদাড়ির মত এই গ্রামটিও এক নদীর তীরে অবস্থিত। গাঁয়ের ছেলে হওয়ার সুবাদে তিনি দেখেছেন প্রবহমান নদী, নৌকা নিয়ে ভেসে চলা মাঝি, কুমোর পাড়ার বাঁশের সাঁকো, কালবৈশাখী, মঙ্গলশঙ্খ, শ্রাবণরাত্রি, নদীর বাঁক, লণ্ঠন, রূপনারণের খরস্রোত। এই প্রকৃতি পরিবেশে আমরা রাম বসুর কবিতায় পাই পরাণ মাঝির মতো মানুষকে। তাঁর কবিতার বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'আমি দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী। দায়বদ্ধতা মানবতার কাছে। তাই আমি বিশ্বাস করি কবিতা হল নীতি শাসিত অর্থময় ও সৌন্দর্যময় বাণী। ছন্দ, রূপ, উপমা, চিত্রকর ইত্যাদি মানুষের এ তাবৎ কালের সমস্ত সাধনাকে অঙ্গীকৃত করে কবিতা হবে রূপময় দ্বিতীয় ভুবন যেখানে আত্মচ্যুতি ঘুচে যাবে মনের রাজ্যে। সে তখন হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ মানুষ। কবিতা তাই আত্ম নির্মাণ। এই আত্ম নির্মাণ আবার বিশ্ব নির্মাণ। বিশ্ব নির্মাণ হবে এক বোধকে কেন্দ্র করে। কবিতা তাই চৈতন্য যার দেহ শব্দ, চিত্র, ছন্দ অর্থাৎ অমূর্তকে মূর্ত করে তোলা কবিতার ধর্ম। তাই কবিতা হল কবির ত্রাণ , তাঁর জীবনের ব্যাখ্যা ও বিস্তৃতি। তাঁর নিঃসঙ্গতার কারাগার থেকে মুক্তি। কবিতা নৈতিক আনন্দে ঈগলের উল্লাস, মানবিক পতনে সমুদ্রের কান্না।[১৮]

রাম বসুর কবিতায় প্রকৃতি যেমন মানবী রূপে উপস্থিত হয়-

"মাইলের পর মাইল টিয়া পাখির ডানার মতো মাঠ
মাইলের পর মাইল ঘুমিয়ে পড়া শষ্যের প্রান্তর
সহোদরার মতো জড়িয়ে ধরত।"

(এক বুক শষ্যের ভিতর)

তেমনি প্রকৃতি প্রেমে লীন হয়ে যায় -

"ঘৃণার সমুদ্রের ওপর উজ্জ্বল রোদ্দুরের মতো আমি-

ঘাসের ঘোমটা ঢাকা কী অবিনশ্বর মোহিনী তুমি
তুমি চাইবে পৃথিবী -জোড়া গানের সাম্রাজ্য

(প্রার্থনা)

নস্টালজিক কবি বারবার ফিরে পেতে চান তাঁর গ্রাম-বাংলাকে যেখানে আম-জাম, দিঘি-হাঁস, ডাগর রাত, শিশিরের শব্দ আর ডুরে শাড়ি-

আবার ফিরে পাবো নাকি ডাগর রাতে শিশির ঝরা
শব্দ আর জোড়া দীঘির হাঁসের ডাক, আম-জামের
ছায়ার নিচে বাঘবন্দী ডুরে শাড়ি চোখ মেলাতে,
পাব নাকি বজ্রশিখা মেঘের জটা সাত মানিক ?

(অধিকৃত)

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় বাস্তবকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে লোকজীবন থেকে শুধু শব্দ অথবা ভাষা সংগ্রহ করেন নি, লৌকিক জীবনের নানা অনুষঙ্গকেও কাব্যশৈলীর উপযোগী করেন এইভাবে -

মাঘ মাসের চাঁদ ছিঁড়ে, নদী ছিঁড়ে, রাত্রির গর্ভের
যন্ত্রণায় স্থির হয়ে শুয়ে থাকা সবিতার ব্রত ছিঁড়ে
পাঁপড়িগুলি দে ছড়িয়ে বাতাসে, মেহের আলী।
খেলা দেখবি, বাতাসে রক্তের খেলা।
সেই রক্ত পান ক'রে শীত তাড়াবে তীর্থের ভূষন্ডি কাক,
সেই রক্তে স্নান করে মৃত্যুকে বুড়ো আঙুল দেখাবে
খড়ের কাকতাড়ুয়া, যে কমণ্ডুলে শান্তি বারি নিয়ে ঘোরে।

(কাব্যগ্রন্থ ঃ নির্বাচিত কবিতা, কবিতা ঃ
জলে ভাসে মাঘব্রত / পৃষ্ঠা - ৮০)

প্রেমকে নিসর্গের পটভূমিতে স্থাপন করে, শৈশবকে বৃক্ষ-জল-পলি-মাটি-খেজুর গুড়-শ্মশানের প্রেক্ষিতে স্থাপন করে, নিসর্গ প্রকৃতিকে নারী-প্রকৃতির সহাবস্থানে রেখে কবি ভূমেন্দ্র গুহ তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'যম' (১৯৯৪), 'ঋতুচক্র' (১৯৯৬), 'পিতামহ' (১৯৯৭)

প্রভৃতিতে লোকজীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছেন। 'শীত ঋতু' কবিতায় দেখি-

"....প্রবীনগাছের ডালে একজোড়া শঙ্খপেঁচা বিষম আগ্রহে এসে বসে,
আমাদের ফেলে আসা গ্রামগুলি কাছে-দূরে
নীলিম ডিমের মতো শক্ত পড়ে আছে।
সীমান্ত পেরিয়ে যাই শৈবাল মাড়িয়ে
মাথার উপরে মেঘ, তার সন্নিকটে এক বিশীর্ণ
চাঁদের রেখা ....।"

(দেশ ঃ ৪ এপ্রিল, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৯১)

গ্রাম-প্রকৃতির প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে লেখা 'অসহ্য বিস্ময়ে আছি' কবিতাটিও চিনিয়ে দেয় কবি ভূমেন্দ্র গুহ লোকায়ত সমাজের সাথে অন্বিত -

"প্রথম বালক
দূরে অবগাহী মাঠ বটগাছ তার পাশে ক্ষীণকটি নদী
নোনা ধরা মন্দিরের ইঁট, শ্মশানের পলি-

(কাব্যগ্রন্থ ঃ যম)

বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কীর্তনখোলা নদী তীরবর্তী মৈশালী গ্রামে জীবনের প্রথম দেড় দশক অতিবাহিত হয়েছিল বলেই কবি শুণ্যগর্ভ নগরজীবনের একাকীত্ব ও যন্ত্রণার বিপ্রতীপে লোকত্তর ভার-ভাবনাকে কাব্যে সাবলীল করেছেন।

কবি বিপুল চক্রবর্তী রোমান্টিক কবি। তাঁর কবিতা থাকে 'জীবন পিপাসার পাশে। ১৯৮০ থেকে তাঁর কাব্য প্রকাশের শুরু। আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে তাঁর কাব্য গ্রন্থ। 'তোমার মারের পালা শেষ হলে' (১৯৮০), 'আমি দেখছি' (১৯৮২), 'নীল পাহাড়ের দেশে' (১৯৮৫), 'দুঃখের আঁধার রাতে, প্রিয় (১৯৮৭), 'তোর মুখ দেখতে চাই' (১৯৮৮) প্রভৃতি কাব্যে কবির হৃদয় উত্তাপে প্রস্ফুটিত হয়েছে কবিতা-কুসুম। বিপুল চক্রবর্তীর কবি-মানস লোকায়ত। তাই তিনি লৌকিক ঐতিহ্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে লেখেন-

ঘন সবুজ তরমুজের মতো আমার কবিতা

মাটি মেঘে জেগে থাকে,...

আমার কবিতা থাক জীবনে পিপাসার পাশে ।

মাটি আর মেঘ নিয়েই লোক-জীবন । সেখানেই কবির রোমান্টিক ও রিয়ালিস্টিক অনুভূতির মেলবন্ধন ।

১৯৮৬ সালে লেখা কবি রথীন্দ্র সেনগুপ্তের 'প্রিয়তম সুখ দুঃখ' কাব্যের শালুক দেখেছে রামধনু রাতের আকাশে' কবিতায় গ্রাম বাংলার নিসর্গ প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে -

শালুক উঠেছে ফুটে

অগোচরে নিঝ্‌ঝুম রাতে

এই জাগরণ তার যেন

খুব ভেতরের থেকে উঠে আসা ।

সুধীর বেরার কবিতার মূল উৎসস্থল মানবপ্রীতি । কবিতায় কাব্য-বিলাস নয়, জীবন-ধর্ম সম্পূর্ণ রূপে তুলে ধরাতেই তাঁর আগ্রহ । 'জল-জনতা-নারী' (১৯৭৬) কাব্য গ্রন্থের 'আমি এ দেশেই মরব' কবিতায় কবির সংবেদনশীল মনের বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটে এইভাবে-

আমার দুঃখিনী মায়ের

চোখের জল যদি মোছাতে না পারি-

তার চোখের জলের সঙ্গে

আমার চোখের জল মিলিয়ে কাঁদবো ।

লোকায়ত গ্রাম-বাংলার অবহেলিত, অবজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত নিসর্গ জগতের প্রতি সুধীর বেরার গভীর ভালোবাসা ছিল বলেই তিনি এ ধরণের কবিতা লিখতে পেরেছেন ।

শক্তি চট্টোপধ্যায় ঃ কোনো মহৎ কবিই তাঁর সমকাল থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না যেহেতু সেই সমকালের বৃন্তে ফুলের মতোই ফুটে থাকে মানুষ ও তার জীবন । সমকালকে নিয়ে, তাকে ব্যবহার করে কালোত্তীর্ণ হওয়াই কবির অভীপ্সা । লক্ষ করলে দেখা যাবে, বাংলা কবিতার রূপ তাপস শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর সমকাল এবং ঘূর্ণাবর্তে অস্থির লোকজীবনের অস্তিত্বকে ভুলে যাননি, অস্বীকার করেন নি তাঁদের আনন্দ-বেদনার অনুষঙ্গকে ।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় রয়েছে লোকজীবনের সানন্দ স্বীকৃতি । তাঁর অধিকাংশ কবিতায় নেই কোনো আফশোস, আত্মকরুণা । লোকজীবনকে এক সহজ প্রসন্নতায় গ্রহণই তাঁর শক্তির পরিচয় । তাঁর কাব্যে উচ্ছ্বাস কম, উগ্রতা আরো কম । সমসাময়িক লোকজীবনের নানা রুগ্নতাকে প্রত্যক্ষ করে তারই মাঝে তিনি সজীব থেকেছেন বার বার । নিস্পৃহতা নয়, টান টান উদ্বেগের সঙ্গেও নয়, লোকজীবন ও লোকজগতকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় গ্রহণ করেছিলেন সহমর্মিতায় । ব্যক্তিগত অথবা বিশ্বগত কোনো আঘাতই কবির সহমর্মী সমগ্রতা বোধের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারেনি । 'মানুষ, নানা রকমের মানুষ শক্তির কবিতায় বারেবারে উঠে এসেছে । সামান্য মানুষ, অসামান্য মানুষ, দুঃখী মানুষ, সুখী মানুষের মুখশ্রী শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় নানাভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে । একটি কবিতায় এমন এক মানবীর কথা পাচ্ছি, যাকে তার স্বামী নেয় না । উপেক্ষিতা, অনাদৃতা সে, সেই মেয়ে তবুও তার স্বামীর কল্যাণ চায় । যত অপমান, কষ্টই দিয়ে যাক তার বিবাহিত জীবন সঙ্গীটি, সেই মেয়ে কিন্তু তার কল্যাণই চায় । এই মেয়েটির প্রসঙ্গে কবি ব্যবহার করেছেন একটি বিশেষ লোকসংস্কার - 'সুদর্শন পোকার কাছে প্রার্থনা ।' জীবনানন্দ ' রূপসী বাংলা ' কাব্যে যেখানে বলেন , 'সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে,' সেখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বেরিয়ে এস সুদর্শন পোকা ।' কিন্ত কেন সুদর্শন পোকা বেরিয়ে আসবে ? উত্তরটা এক লোকজ সংস্কারের মধ্যে নিহিত রয়েছে, 'সুদর্শন পোকার কাছে প্রার্থনা করলে তা পূরণ হয় বলে মেয়েলি বিশ্বাস ।' 'পথের পাঁচালী উপন্যাসের দুর্গাও সুদর্শন পোকার কাছে তার সৌভাগ্য কামনা করেছিল ঐ আর্তি-আকুলতা নিয়েই । 'সুদর্শন পোকা' কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় গ্রাম বাংলার এমন এক নারীর কথা উল্লেখ করেছেন যাকে তার স্বামী নেয় না । তবুও জীবনের হাতে মার খাওয়া স্বামীর কল্যাণ কামনা করে-

'আঙুল চেলে গন্ডি করি সুদর্শন পোকা
নিখারি হাতে গড় করছি সুদর্শন পোকা.... ।'

স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েটির সবই গেছে-

'তামাভরন যেটুকু ছিল স্যাকরা বাড়ি গ্যালো

চার খেজুর গাছের রস মোল্লাবাড়ি পেলো ।
পরার কানি হাতের পানি, মড়ার কাঠ কই
ছেলে পুলের বুক না তো ও ডোঙার ওপর-ছই ।'[২০]

অন্তিম আকুতি ভরা অসহায়া এক গ্রাম্য নারীর হৃদয়খানি আন্তরিক সহজ বাচিকে ধরা পড়েছে 'সুদর্শন পোকা' কবিতায় । লোকজীবন এইভাবে বারবার ধরা দেয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় ।

আলোচ্য অধ্যায়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু থেকে আমরা পাই -

১. কবিমনের আবেগ-গভীরতা ও কবিপ্রাণের উন্মাদনা । এ দুই-ই সমৃদ্ধ করেছে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতাকে ।

২. নন্দন তত্ত্বের ইন্দ্রজাল-ইন্দ্রধনুচ্ছটা অপেক্ষা বৈপ্লবিক বাস্তব-চেতনা অনেক কবির কাব্য- ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে ।

৩. দেশের প্রতি জন্মগত টানে কবিরা তাঁদের কবিতায় ভালবাসার ছাপ রেখেছেন, প্রাণের আকাঙখার কথা বলেছেন, সোনার ফসলের আশায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন । এককথায়, বহু কবি হৃদয় দিয়ে কবিতা লিখেছেন এ সময় । অনেকে আশায় বুক বেঁধে সুবাতাসময় সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন,অন্যকে স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করেছেন । এরা প্রকৃত অর্থেই Optimist কবি ।

৪. আইডেনটিটির জন্যে ব্যাকুলতার কথা বিশ শতকের অন্ত্যলগ্ন অনেক কবির কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার ।

৫. শুধু শহর জীবন নয়, বাংলার গ্রামীন প্রকৃতি এবং গ্রাম মানুষের সাধারণ জীবন যাত্রা অনেক কবিকে প্রভাবিত করেছে । এই কবিদের কবিতায় রয়েছে মাটির গন্ধ ।

৬. শুধু শব্দের চয়ন ও বয়নে কাব্যের কায়া নির্মিতি নয়, এ সময় কবিদের অনেকেই ছিলেন শব্দ-মৃগয়ার ক্ষেত্রে পরিশ্রমী ।

৭. আলোচ্য সময়-সীমার গন্ডিতে কোনো কোনো কবি প্রমাণ করেছেন যে তাঁদের মন কাদা-জলের মতো নরম-তরল অথচ সমুদ্রের মতো বিশাল ।

৮. এপার বাংলায় নকশালবাড়ি আন্দোলন, ওপার বাংলায় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের সব কবিই কম-বেশি ভাবিত ছিলেন ।

৯. এ সময়ে অনেকে কবির মানস-ভূমি কর্ষিত হয়েছে লোকঐতিহ্য ও গ্রাম-জীবন উপাদানের হলকর্ষণে।

১০. শব্দ চয়ন ও বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক কবি লোক-ভাষার বিপুল ভান্ডার থেকে অজস্র উপাদান সংগ্রহ করেছেন ।

১১. কোনো কোনো কবির কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে কথোপকথনের ভাষা ।

১২. কোনো কবি-মন স্বীকৃতি জানিয়েছে যুগোচিত চিত্রকল্প সৃষ্টিতে। অনেকে আবার 'আধুনিকতা'র সঙ্গে 'ঐতিহ্যে'র মেলবন্ধন ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছেন ।

১৩. অনেক কবির কবিতায় কিউবিজম, একসপ্রেসনিজম, মার্কসিজম প্রভৃতি প্রকরণ ছাপিয়ে বিচ্ছেদবেদনা, বিরহ জনিত উদ্দাম হাহাকার স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে ।

১৪. প্রজ্ঞা ও দর্শনজাত গভীর-গূঢ় চিন্তা অনেক কবির কবিতায় অনুপুঙ্খ জড়িয়ে আছে ।

তথ্যসূত্র ও ঋণস্বীকার

১. বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা (২য় খন্ড / সম্পাদনা -সামন্ত সুবল / প্রকাশক এবং মুশায়েরা, কলকাতা -৯০

২. তবে / পৃষ্ঠা

৩. তথ্য কেন্দ্র (শারদ সংখ্যা, ১৪১১), কবিতা 'যা আমি পারি না'

৪. চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৭২) কবিতা ৯৫ সংখ্যক।

৫. 'যা আমি পারি না' / তথ্যকেন্দ্র শারদ সংখ্যা ১৪১১) পত্রিকায় প্রকাশিত।

৬. কবিতা ঃ বাড়ি / কবি ঃ নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী (আজকাল (রবিবাসরীয়) ৩ জুন ১৯৮৯

৭. কবিতা ঃ বাঁচা, এরই জন্যে বেঁচে থাকা, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (দেশ, ১৭-১০-১৯৯৭/ পৃষ্ঠা -৫২)

৮. দেশ , ২৭ নভেম্বর, ১৯৯৭ / পৃঃ ২৯ / প্রবন্ধ 'কবিতা কার জন্য' ?

৯. কবিতা ঃ কালের প্রহরী, বাঁশির লহরী
কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (আজকাল শারদীয়া ১৩৯৮)

১০. নিজের জীবন, বীজের জীবন- জয় গোস্বামী
দেশ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ / পৃঃ ৫৮

১১. তদেব ঃ পৃষ্ঠা- ৭০

১২. লোকাভরণ / বিপ্লব চক্রবর্তী (১ম প্রকাশ / পৃষ্ঠা ২৮৬)

১৩. অলৌকিক প্রতিশোধ / কৃষ্ণা বসু / দেশ ঃ ৩১-১০-১৯৯৮

১৪. বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা (২য় খণ্ড) / সম্পাদনা ঃ সুবল সামন্ত / পৃষ্ঠা- ২৮০

১৫. আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা - ড° অশোক কুমার মিত্র / পৃষ্ঠা - ৩৫২

১৬. এখন শীতকাল - অরুণ কুমার চট্টোপাধায় / দেশ ১৪.০১.১৯৮৭ পৃষ্ঠা - ৭১

১৭. এখন শীতকাল - অরুণ কুমার চট্টোপাধায় / দেশ ১৪.০১.১৯৮৭ পৃষ্ঠা - ৭১

১৮. বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা (২য় খন্ড) / সম্পাদনা ঃ সুবল সামন্ত / পৃষ্ঠা - ১৮

১৯. রবীন্দ্রোত্তর কবিতা বৈচিত্র - সম্পাদনা - দেবাংশু ঘোষ, পৃষ্ঠা - ১৫৩ / কৃষ্ণা বসুর প্রবন্ধ ঃ 'শক্তির কবিতা যেন এক মায়া ঘোর'।

২০. তদেব / পৃষ্ঠা - ১৫৪।